EHSANUL HOQUE SAJID

কুরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে

খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবন

আবু বকর (রা.) থেকে হাসান (রা.) পর্যন্ত
২৬ পর্বে ধারাবাহিক জীবনী

সংকলন ও সম্পাদনা

ইহছানুল হক ছাজিদ

কুরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে

খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবন

আবু বকর (রা.) থেকে হাসান (রা.) পর্যন্ত

২৬ পর্বে ধারাবাহিক জীবনী

সংকলন ও সম্পাদনা

ইহছানুল হক ছাজিদ

এআই সহায়তায় প্রস্তুত; সম্পাদনা ও যাচাই: ইহছানুল হক ছাজিদ

সূচিপত্র

প্রথম খলিফা — আবু বকর আস-সিদ্দীক (রা.) পর্ব ১–৬

১ আবু বকর আস-সিদ্দীক (রা.) ৬
২ রিদ্দার যুদ্ধ ৯
৩ কুরআন সংকলনের সূচনা ১২
৪ উসামাহ ইবন যায়েদ (রা.)-এর বাহিনী প্রেরণ ১৬
৫ ইরাক ও শাম বিজয়ের সূচনা ২০
৬ আবু বকর (রা.)-এর শেষ দিনগুলো, উমর (রা.)-কে উত্তরসূরি মনোনয়ন এবং একজন মহান খলিফার ইন্তিকাল ২৩

দ্বিতীয় খলিফা — উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) পর্ব ৭–১৩

৭ উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) ২৮
৮ ইয়ারমুকের বিজয় ৩১
৯ কাদিসিয়ার যুদ্ধ ও পারস্য বিজয়ের সূচনা ৩৪
১০ বায়তুল মুকাদ্দাস (জেরুজালেম) বিজয় ৩৭
১১ উমর (রা.)-এর রাষ্ট্রব্যবস্থা ও প্রশাসনিক সংস্কার ৪০
১২ আমওয়াসের মহামারি ও উমর (রা.)-এর নেতৃত্ব ৪২
১৩ উমর (রা.)-এর শাহাদাত ৪৫

তৃতীয় খলিফা — উসমান ইবন আফফান (রা.) পর্ব ১৪–১৮

১৪ উসমান ইবন আফফান (রা.)-এর খিলাফতের সূচনা ৪৯
১৫ উসমান (রা.)-এর শাসনামলে ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তার ৫১
১৬ উসমান (রা.)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান ৫৪
১৭ উসমান (রা.)-এর খিলাফতের পরিবর্তিত পরিস্থিতি ৫৭
১৮ উসমান (রা.)-এর অবরোধ ও শাহাদাত ৬০

চতুর্থ খলিফা — আলী ইবন আবি তালিব (রা.) পর্ব ১৯–২৩

১৯ আলী (রা.)-এর খিলাফতের সূচনা ৬৪

২০ জামাল যুদ্ধ ৬৭

২১ সিফফিনের যুদ্ধ ৭১

২২ খাওয়ারিজের উত্থান ও নাহরাওয়ানের যুদ্ধ ৭৫

২৩ আলী (রা.)-এর শাহাদাত ৭৯

সমাপনী পর্যায় — হাসান (রা.) ও সামগ্রিক মূল্যায়ন পর্ব ২৪–২৬

২৪ হাসান (রা.)-এর খিলাফত ও ঐতিহাসিক সন্ধি ৮৪

২৫ হাসান (রা.)-এর পরবর্তী জীবন ও ইন্তিকাল ৮৮

২৬ খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের সামগ্রিক মূল্যায়ন ৯২

উদ্ধৃত সূত্রসমূহ

পর্ব অনুযায়ী সূত্রের তালিকা ৯৬

প্রথম খলিফা

আবু বকর আস-সিদ্দীক (রা.)

খিলাফতের সূচনা, রিদ্দার যুদ্ধ, কুরআন সংকলন ও প্রথম বিজয়

পর্ব ১ – ৬

পর্ব

১

আবু বকর আস-সিদ্দীক (রা.)

ইসলামের প্রথম খলিফা, সত্যবাদিতার অনন্য দৃষ্টান্ত এবং উম্মাহর ঐক্যের রক্ষক

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর মুসলিম উম্মাহ এক গভীর পরীক্ষার মুখোমুখি হলো। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) তাঁদের প্রিয় নবীকে হারিয়ে শোকে মুহ্যমান ছিলেন। একই সময়ে ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্বের প্রশ্নও সামনে এসে দাঁড়ায়।

এমন সংকটময় মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা উম্মাহকে এমন একজন নেতার মাধ্যমে একত্রিত করলেন, যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সাহাবি, প্রথম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মুসলিম, হিজরতের সঙ্গী এবং জীবদ্দশায়ই জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের একজন—আবু বকর আস-সিদ্দীক (রা.)।

তাঁর প্রকৃত নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবন আবি কুহাফা আত-তাইমি (রা.)। তবে তিনি আবু বকর নামেই অধিক পরিচিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে "আস-সিদ্দীক" (অত্যন্ত সত্যবাদী) উপাধি প্রদান করেন। কারণ তিনি সর্বপ্রথম ও নিঃসংকোচে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, বিশেষত ইসরা ও মি'রাজের ঘটনার পর, যখন অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। (মুসতাদরাক আল-হাকিম, হাদিস: ৪৪০৭; সনদ হাসান বলে বহু আলিম উল্লেখ করেছেন)

আবু বকর (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর নিজের সম্পদ, সময় এবং জীবন সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন।

তাঁর দাওয়াতের মাধ্যমেই উসমান ইবন আফফান (রা.), যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.), আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা.), সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং তালহা ইবন উবাইদুল্লাহ (রা.)-এর মতো মহান সাহাবিরা ইসলাম গ্রহণ করেন।

হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم তাঁকেই সফরসঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে তাঁদের সেই ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেন,

> "যখন তারা দুজন গুহার মধ্যে ছিলেন, তখন তিনি তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন, 'চিন্তা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।'"
>
> — সূরা আত-তাওবা, ৯:৪০

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর ইন্তিকালের পর আনসারদের একটি দল নতুন নেতৃত্বের বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য সাকিফা বানু সাঈদাহ-এ সমবেত হন।

এ সংবাদ পেয়ে আবু বকর (রা.), উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এবং আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.) সেখানে উপস্থিত হন।

আবু বকর (রা.) আনসারদের মর্যাদা ও ইসলামের জন্য তাঁদের অসামান্য অবদানের আন্তরিক প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ইসলামে তাঁদের অবদান অনন্য। তবে তিনি এ-ও স্মরণ করিয়ে দেন যে, আরবের অধিকাংশ গোত্র কুরাইশের নেতৃত্বই সহজে গ্রহণ করবে।

তিনি উমর (রা.) ও আবু উবাইদাহ (রা.)-এর নামও নেতৃত্বের জন্য প্রস্তাব করেন।

কিন্তু উমর (রা.) সঙ্গে সঙ্গে আবু বকর (রা.)-এর হাত ধরে তাঁর প্রতি বাইআত করেন এবং বলেন,

> "রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم যাঁকে আমাদের দ্বীনের (সালাতের) জন্য অগ্রাধিকার দিয়েছেন, আমরা কি তাঁকে আমাদের দুনিয়ার নেতৃত্বের জন্য অগ্রাধিকার দেব না ?"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৬৮৩; ৭২১৯

এরপর উপস্থিত সাহাবিগণ একে একে আবু বকর (রা.)-এর হাতে বাইআত করেন।

পরদিন মসজিদে নববীতে সর্বসাধারণের বাইআত সম্পন্ন হয় এবং তিনি মুসলিম উম্মাহর প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৭২১৮–৭২১৯)

খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি একটি ঐতিহাসিক ভাষণ দেন।

তিনি বলেন,

> "আমাকে তোমাদের শাসক করা হয়েছে, অথচ আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নই। আমি যদি সঠিক কাজ করি, তবে আমাকে সহযোগিতা করো। আর যদি ভুল করি, তবে আমাকে সংশোধন করে দিও। সত্য হলো আমানত, আর মিথ্যা হলো বিশ্বাসঘাতকতা। তোমাদের দুর্বল ব্যক্তি আমার কাছে শক্তিশালী, যতক্ষণ না আমি তার অধিকার ফিরিয়ে দিই। আর তোমাদের শক্তিশালী ব্যক্তি আমার কাছে দুর্বল, যতক্ষণ না আমি তার কাছ থেকে অন্যের অধিকার আদায় করি। যতক্ষণ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করি, ততক্ষণ তোমরা আমার আনুগত্য করবে। আর যদি আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হই, তবে আমার আনুগত্য তোমাদের জন্য আবশ্যক নয়।"
>
> — আত-তারীখ, আত-তাবারি; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ

এই ভাষণ ইসলামী নেতৃত্বের মূলনীতি স্পষ্ট করে দেয়—ক্ষমতা নয়, বরং আমানত; শাসন নয়, বরং জবাবদিহিতা; ব্যক্তিপূজা নয়, বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য।

আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতের শুরুতেই মুসলিম উম্মাহ কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। আরবের বিভিন্ন গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়, কেউ কেউ মিথ্যা নবুওয়াতের দাবি করে, আবার অনেকে ইসলাম ত্যাগ করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

এগুলোই ছিল তাঁর খিলাফতের প্রথম এবং সবচেয়ে বড় পরীক্ষা।

এই পর্ব আমাদের শেখায়, একজন প্রকৃত নেতা সংকটের সময় ধৈর্য, প্রজ্ঞা এবং আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রেখে উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করেন। আবু বকর (রা.)-এর জীবন প্রমাণ করে, সত্যবাদিতা, বিনয় এবং ঈমানই একজন নেতার সবচেয়ে বড় শক্তি।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
রিদ্দার যুদ্ধ: মিথ্যা নবীদের উত্থান, যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে আবু বকর (রা.)-এর দৃঢ় অবস্থান এবং ইসলামী রাষ্ট্রের ঐক্য রক্ষা।

পর্ব

২

রিদ্দার যুদ্ধ

মিথ্যা নবীদের উত্থান, যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে আবু বকর (রা.)-এর দৃঢ় অবস্থান এবং ইসলামী রাষ্ট্রের ঐক্য রক্ষা

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর ইন্তিকালের পর মুসলিম উম্মাহ এক অভূতপূর্ব সংকটের মুখোমুখি হলো। আরব উপদ্বীপের অনেক গোত্র ইসলাম থেকে ফিরে গেল, কেউ যাকাত দিতে অস্বীকার করল, আবার কেউ নতুন নতুন মিথ্যা নবীর অনুসারী হয়ে পড়ল।

এ পরিস্থিতিকে ইসলামের ইতিহাসে রিদ্দার ফিতনা (ধর্মত্যাগ ও বিদ্রোহের সংকট) বলা হয়।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মিথ্যা নবীদের মধ্যে ছিল মুসাইলিমাহ আল-কাযযাব, তুলাইহা ইবন খুওয়াইলিদ, সাজাহ বিনতে হারিস এবং ইয়েমেনে আল-আসওয়াদ আল-আনসি। তারা নবুওয়াতের মিথ্যা দাবি করে বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছিল। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৬২১; তারীখ আত-তাবারি; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ)

অন্যদিকে কিছু গোত্র বলল,

> "আমরা সালাত আদায় করব, কিন্তু যাকাত দেব না।"

তারা মনে করেছিল, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর ইন্তিকালের সঙ্গে যাকাতের বাধ্যবাধকতাও শেষ হয়ে গেছে।

কিন্তু আবু বকর আস-সিদ্দীক (রা.) এ বিষয়ে এক বিন্দুও আপস করেননি।

তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করলেন,

> "আল্লাহর কসম! যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। আল্লাহর কসম! তারা যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যে একটি উটের রশিও দিত, সেটিও আমাকে দিতে অস্বীকার করে, তবুও আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ১৪০০; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২০

প্রথমদিকে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) মনে করেছিলেন, যারা শুধু যাকাত অস্বীকার করছে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ না করাই ভালো।

তিনি আবু বকর (রা.)-কে বললেন,

> "আপনি কীভাবে এমন লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে?"

তখন আবু বকর (রা.) তাঁর দৃঢ় অবস্থানের কথা পুনরায় ব্যক্ত করলেন।

উমর (রা.) পরে বলেন,

> "আমি বুঝতে পারলাম, আল্লাহ আবু বকরের অন্তরকে সত্যের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তখন আমি নিশ্চিত হলাম, তাঁর সিদ্ধান্তই সঠিক।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ১৪০০

এরপর আবু বকর (রা.) আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে পৃথক পৃথক সেনাদল পাঠালেন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (রা.)।

তিনি একের পর এক বিদ্রোহী গোত্রকে পরাজিত করেন।

অবশেষে ইয়ামামার যুদ্ধে মুসাইলিমাহ আল-কাযযাবের বিশাল বাহিনীর সঙ্গে মুসলিমদের ভয়াবহ যুদ্ধ হয়।

এই যুদ্ধে বহু সাহাবি শাহাদাত বরণ করেন।

বিশেষ করে কুরআনের বহু হাফিজ শহীদ হওয়ায় মুসলিম উম্মাহ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে।

শেষ পর্যন্ত সাহাবি ওয়াহশী ইবন হারব (রা.)—যিনি জাহিলিয়াতের যুগে উহুদের যুদ্ধে হামযা (রা.)-কে হত্যা করেছিলেন এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন—তিনি মুসাইলিমাহকে হত্যা করেন। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪০৭২)

রিদ্দার যুদ্ধের মাধ্যমে আরব উপদ্বীপে পুনরায় ইসলামী রাষ্ট্রের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

মিথ্যা নবীদের ফিতনা দমন হয় এবং যাকাতব্যবস্থা পুনরায় কার্যকর হয়।

আবু বকর (রা.) প্রমাণ করে দিলেন, ইসলামে আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে আপসের কোনো সুযোগ নেই।

এই সংকটময় সময়ে তাঁর দৃঢ়তা না থাকলে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র ভেঙে পড়তে পারত।

রিদ্দার যুদ্ধ আমাদের শেখায়, দ্বীনের মৌলিক বিধানের ক্ষেত্রে আপস করা যায় না। একজন ন্যায়পরায়ণ নেতার দায়িত্ব হলো সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা, যদিও তা সাময়িকভাবে কঠিন মনে হয়।

এ ঘটনায় আরও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা সংকটের সময় তাঁর দ্বীনের জন্য এমন ব্যক্তিদের নির্বাচন করেন, যারা সত্যের ওপর অবিচল থাকেন।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:

কুরআন সংকলনের সূচনা: ইয়ামামার যুদ্ধের পর হাফিজ সাহাবিদের শাহাদাত, উমর (রা.)-এর পরামর্শ এবং আবু বকর (রা.)-এর যুগে কুরআন একত্রে সংকলনের ঐতিহাসিক উদ্যোগ।

পর্ব

৩

কুরআন সংকলনের সূচনা

ইয়ামামার যুদ্ধের পর হাফিজ সাহাবিদের শাহাদাত এবং আবু বকর (রা.)-এর ঐতিহাসিক উদ্যোগ

রিদ্দার যুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল ইয়ামামার যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুসলিমরা বিজয় লাভ করলেও তাঁদের অনেক সাহাবি শাহাদাত বরণ করেন।

বিশেষ করে কুরআনের বহু হাফিজ সাহাবি শহীদ হওয়ায় উম্মাহর সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দিল—যদি এভাবে হাফিজ সাহাবিরা একের পর এক ইন্তিকাল করেন, তাহলে ভবিষ্যতে কুরআন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

এ বিষয়টি সর্বপ্রথম গভীরভাবে উপলব্ধি করেন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)।

তিনি আবু বকর আস-সিদ্দীক (রা.)-এর কাছে এসে বললেন,

> "ইয়ামামার যুদ্ধে বহু কুরআনের হাফিজ শহীদ হয়েছেন। আমার আশঙ্কা, ভবিষ্যতে বিভিন্ন যুদ্ধে আরও হাফিজ শহীদ হলে কুরআনের কিছু অংশ হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। তাই আমার মত হলো, কুরআনকে একত্রে সংকলন করা উচিত।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪৯৮৬

প্রথমে আবু বকর (রা.) কিছুটা দ্বিধায় পড়ে গেলেন।

তিনি বললেন,

> "রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কাজ করেননি, আমি তা কীভাবে করব ?"

উমর (রা.) বারবার বুঝিয়ে বললেন,

> "আল্লাহর কসম ! এটি একটি কল্যাণকর কাজ।"

অবশেষে আল্লাহ তাআলা আবু বকর (রা.)-এর অন্তরও এ বিষয়ে প্রশস্ত করে দিলেন এবং তিনি উপলব্ধি করলেন যে, এটি দ্বীনের সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪৯৮৬)

এরপর তিনি এ মহান দায়িত্ব অর্পণ করলেন তরুণ সাহাবি যায়েদ ইবন সাবিত (রা.)-এর ওপর।

যায়েদ (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওহি লেখকদের অন্যতম এবং কুরআনের একজন বিশিষ্ট হাফিজ।

আবু বকর (রা.) তাঁকে বললেন,

> "তুমি একজন বুদ্ধিমান যুবক। তোমার ব্যাপারে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য ওহি লিখতে। তাই তুমি কুরআনের আয়াতগুলো সংগ্রহ করে একত্র করো।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪৯৮৬

যায়েদ ইবন সাবিত (রা.) বলেন,

> "আল্লাহর কসম ! তারা যদি আমাকে একটি পাহাড় স্থানান্তরের দায়িত্ব দিত, তবে তা-ও আমার কাছে কুরআন সংকলনের দায়িত্বের চেয়ে সহজ মনে হতো।"

তিনি প্রথমে বলেছিলেন,

> "আপনারা এমন একটি কাজ কীভাবে করছেন, যা রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم করেননি ?"

কিন্তু পরে তিনি বুঝতে পারলেন যে, এটি ইসলামের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর উদ্যোগ। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪৯৮৬)

এরপর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কুরআন সংকলনের কাজ শুরু হলো।

কোনো আয়াত শুধু মুখস্থের ওপর নির্ভর করে গ্রহণ করা হয়নি।

বরং প্রতিটি আয়াতের জন্য দুটি বিষয় নিশ্চিত করা হতো—

সাহাবিদের মুখস্থ (হিফজ) থেকে তা যাচাই করা।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর সামনে লিখিত হয়েছিল—এমন লিখিত দলিল দ্বারা তা প্রমাণ করা।

এভাবে খেজুরপাতা, চামড়া, পাতলা পাথর, পশুর কাঁধের হাড় এবং বিভিন্ন সাহাবির সংরক্ষিত লিখিত নথি থেকে কুরআনের আয়াতগুলো সংগ্রহ করা হয়।

যায়েদ (রা.) অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রতিটি আয়াত যাচাই করে একত্রিত করেন।

এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন একটি সংকলিত মুসহাফে রূপ নেয়।

এই সংকলিত কপি প্রথমে আবু বকর (রা.)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল।

তাঁর ইন্তিকালের পর এটি উমর (রা.)-এর কাছে থাকে।

আর উমর (রা.)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর কন্যা ও উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা.)-এর কাছে সংরক্ষিত হয়। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪৯৮৬)

পরবর্তীতে উসমান ইবন আফফান (রা.)-এর খিলাফতের সময় এই সংকলিত মুসহাফকে ভিত্তি করেই সরকারি কপি প্রস্তুত করে ইসলামের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়।

আল্লাহ তাআলা কুরআন সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন,

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

অর্থ

"নিশ্চয়ই আমিই এ উপদেশ (কুরআন) নাযিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক।"

— সূরা আল-হিজর, ১৫:৯

আবু বকর (রা.)-এর যুগে কুরআন সংকলনের এই ঐতিহাসিক উদ্যোগ ছিল আল্লাহর সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

এই পর্ব আমাদের শেখায়, দ্বীনের সংরক্ষণে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) কতটা দায়িত্বশীল ছিলেন। তাঁদের সতর্কতা, আমানতদারিতা এবং নির্ভুল যাচাইয়ের কারণেই আজও কুরআন অবিকৃত অবস্থায় পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের হাতে পৌঁছেছে।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:

উসামাহ ইবন যায়েদ (রা.)-এর বাহিনী প্রেরণ: আবু বকর (রা.)-এর অটল নেতৃত্ব, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশ বাস্তবায়ন এবং মুসলিম রাষ্ট্রের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা।

পর্ব

৪

উসামাহ ইবন যায়েদ (রা.)-এর বাহিনী প্রেরণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশ বাস্তবায়ন, আবু বকর (রা.)-এর অটল নেতৃত্ব এবং ইসলামী রাষ্ট্রের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের শেষ দিনগুলোতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল শামের সীমান্তে রোমান (বাইজেন্টাইন) সাম্রাজ্যের মিত্র বাহিনীর গতিবিধির জবাব দেওয়া এবং মু'তার যুদ্ধে শহীদ সাহাবিদের রক্তের প্রতিশোধ নেওয়া।

এই অভিযানের সেনাপতি হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ মনোনীত করেছিলেন মাত্র আঠারো থেকে বিশ বছর বয়সী সাহাবি উসামাহ ইবন যায়েদ (রা.)-কে।

উসামাহ (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অত্যন্ত প্রিয় সাহাবি যায়েদ ইবন হারিসা (রা.)-এর পুত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি বলেছিলেন,

> "হে আল্লাহ! আমি তাকে ভালোবাসি, আপনিও তাকে ভালোবাসুন।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৭৩৫; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৪২২

উসামাহ (রা.)-এর অল্প বয়স দেখে কিছু লোক বিস্ময় প্রকাশ করেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> "তোমরা যদি আজ তার নেতৃত্ব নিয়ে আপত্তি কর, তবে এর আগে তার পিতা (যায়েদ)-এর নেতৃত্ব নিয়েও আপত্তি করেছিলে। আল্লাহর কসম! তিনি নেতৃত্বের যোগ্য ছিলেন এবং তাঁর পর এই পুত্রও নেতৃত্বের যোগ্য। আর সে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিদের একজন।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪৪৬৯; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৪২৬

কিন্তু ঠিক এ সময়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসুস্থতা বেড়ে যায়। ফলে বাহিনী মদিনার উপকণ্ঠে জুরফ নামক স্থানে অপেক্ষা করতে থাকে। এর কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেন।

তাঁর ইন্তিকালের পর মুসলিম রাষ্ট্র একের পর এক কঠিন সংকটে পড়ে। আরবের বহু গোত্র বিদ্রোহ করে, মিথ্যা নবীদের উত্থান ঘটে এবং যাকাত অস্বীকারকারীরা শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে।

এমন অবস্থায় অনেক বিশিষ্ট সাহাবি মনে করলেন, বাহিনীকে আপাতত মদিনায় রেখে দেওয়াই নিরাপদ হবে।

তাঁরা আবু বকর (রা.)-কে অনুরোধ করলেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত উসামাহ (রা.)-এর বাহিনী না পাঠাতে।

কিন্তু আবু বকর আস-সিদ্দীক (রা.) দৃঢ়ভাবে বললেন,

> "আল্লাহর কসম! যদি আমি জানি যে হিংস্র জন্তু এসে আমাকে ছিঁড়ে খাবে, তবুও রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বাহিনী প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন, আমি তা অবশ্যই প্রেরণ করব।"
>
> — আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ; তারীখ আত-তাবারি — অর্থগত বর্ণনা

তিনি আরও বললেন,

> "যে পতাকা রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে বেঁধে দিয়েছেন, আমি তা কখনো খুলব না।"

এটি ছিল তাঁর দৃঢ় ঈমান, সুন্নাহর প্রতি আনুগত্য এবং আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুলের অনন্য দৃষ্টান্ত।

এরপর আবু বকর (রা.) নিজেই উসামাহ (রা.)-এর বাহিনীকে বিদায় জানাতে মদিনার বাইরে পর্যন্ত হেঁটে গেলেন।

উসামাহ (রা.) একটি ঘোড়ায় আরোহণ করেছিলেন, আর মুসলিমদের খলিফা আবু বকর (রা.) তাঁর পাশে পায়ে হেঁটে চলছিলেন।

উসামাহ (রা.) বললেন,

> "হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! আপনি হয় বাহনে আরোহণ করুন, নতুবা আমি নেমে যাই।"

আবু বকর (রা.) জবাব দিলেন,

> "আল্লাহর কসম! তুমি নামবে না এবং আমিও বাহনে আরোহণ করব না। আল্লাহর পথে কিছুক্ষণ আমার পা ধুলায় ধূসর হলে তাতে আমার কী ক্ষতি?"
>
> — আল-মুওয়াত্তা, ইমাম মালিক; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ — অর্থগতভাবে বর্ণিত

এরপর তিনি উসামাহ (রা.)-কে কয়েকটি মূল্যবান উপদেশ দিলেন।

তিনি বললেন,

আল্লাহর নামে এবং তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করবে।

বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।

যুদ্ধলব্ধ সম্পদে খিয়ানত করবে না।

শিশু, নারী ও বৃদ্ধকে হত্যা করবে না।

ফলদায়ক গাছ কেটে ফেলবে না এবং অযথা ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে না।

গবাদি পশু অকারণে হত্যা করবে না।

যারা ইবাদতে নিমগ্ন থাকবে, তাদের ক্ষতি করবে না। (আল-মুওয়াত্তা; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ)

এই নির্দেশনাগুলো ইসলামের যুদ্ধনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।

উসামাহ (রা.)-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী শামের সীমান্তে পৌঁছে সফলভাবে অভিযান পরিচালনা করে।

শত্রুপক্ষ বুঝতে পারল, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর ইন্তিকালের পরও মুসলিম রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়েনি।

বাহিনী নিরাপদে ও সফলতার সঙ্গে মদিনায় ফিরে আসে।

এই অভিযানের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর।

বিদ্রোহী গোত্রগুলো উপলব্ধি করল, মুসলিম নেতৃত্ব দুর্বল হয়নি। ফলে অনেক বিদ্রোহী ভীত হয়ে পড়ে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের মর্যাদা আরও সুদৃঢ় হয়। এর ফলে আবু বকর (রা.) পরবর্তীতে রিদ্দার যুদ্ধ পরিচালনায় আরও দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করতে সক্ষম হন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾

অর্থ

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো।"

— সূরা আন-নিসা, ৪:৫৯

আবু বকর (রা.)-এর এই সিদ্ধান্ত ছিল এ আয়াতের বাস্তব প্রয়োগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি পরিস্থিতির কঠিনতা নয়, বরং রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর নির্দেশকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

এই পর্ব আমাদের শেখায়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের প্রতি অবিচল আনুগত্যই একজন মুমিনের প্রকৃত শক্তি। পাশাপাশি একজন আদর্শ নেতা কখনো ব্যক্তিগত মর্যাদাকে বড় মনে করেন না; বরং সত্য, সুন্নাহ এবং উম্মাহর কল্যাণকে সর্বাগ্রে স্থান দেন।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:

আবু বকর (রা.)-এর যুগে ইরাক ও শাম বিজয়ের সূচনা — ইসলামের প্রথম বৃহৎ সামরিক অগ্রযাত্রা, খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (রা.)-এর নেতৃত্ব এবং পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তার।

পর্ব

৫

ইরাক ও শাম বিজয়ের সূচনা

ইসলামের প্রথম বৃহৎ সামরিক অগ্রযাত্রা, খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (রা.)-এর নেতৃত্ব এবং পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তার

রিদ্দার যুদ্ধের সফল সমাপ্তির পর আরব উপদ্বীপে পুনরায় স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। মিথ্যা নবীদের ফিতনা দমন হয়, যাকাত ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইসলামী রাষ্ট্রের ঐক্য সুদৃঢ় হয়।

এরপর আবু বকর আস-সিদ্দীক (রা.) ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং প্রতিবেশী শক্তিগুলোর আগ্রাসন প্রতিহত করার লক্ষ্যে ইরাক ও শামের দিকে দাওয়াত ও সামরিক অভিযান শুরু করেন।

তৎকালীন পৃথিবীর দুটি পরাশক্তি ছিল পারস্য (সাসানীয় সাম্রাজ্য) এবং রোমান (বাইজেন্টাইন) সাম্রাজ্য। এ দুটি সাম্রাজ্য দীর্ঘদিন ধরে আরব অঞ্চলে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করছিল এবং মুসলিম রাষ্ট্রের জন্যও সম্ভাব্য হুমকি ছিল।

আবু বকর (রা.) প্রথমে ইরাকের দিকে একাধিক বাহিনী প্রেরণ করেন। এর নেতৃত্বে ছিলেন ইসলামের বীর সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (রা.)।

খালিদ (রা.) একের পর এক যুদ্ধে অসাধারণ কৌশল ও সাহসিকতার পরিচয় দেন।

সালাসিলের যুদ্ধ, মাজারের যুদ্ধ, ওয়ালাজার যুদ্ধ, উলাইসের যুদ্ধ এবং হিরা বিজয়—এসব অভিযানে মুসলিম বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করে। (আত-তাবারি; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ)

হিরা অঞ্চলের অধিবাসীরা মুসলিমদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করে। যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি, তারা ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে নিরাপদে বসবাসের শর্তে জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়।

এ সময় আবু বকর (রা.) সেনাপতিদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, যুদ্ধের উদ্দেশ্য মানুষের ওপর জুলুম করা নয়; বরং আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া এবং নির্যাতনের অবসান ঘটানো।

তিনি নির্দেশ দেন,

> "বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, খিয়ানত করবে না, মৃতদেহ বিকৃত করবে না, শিশু, নারী ও বৃদ্ধকে হত্যা করবে না। ফলদায়ক গাছ কেটো না, পশু অকারণে হত্যা কোরো না এবং ইবাদতে নিমগ্ন সন্ন্যাসীদের কষ্ট দিও না।"
>
> — আল-মুওয়াত্তা, ইমাম মালিক; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ

এদিকে শামের দিকেও মুসলিম বাহিনী অগ্রসর হতে শুরু করে।

আবু বকর (রা.) চারটি পৃথক বাহিনী প্রেরণ করেন। তাঁদের সেনাপতি ছিলেন—

আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)

ইয়াযিদ ইবন আবি সুফিয়ান (রা.)

শুরাহবিল ইবন হাসানাহ (রা.)

আমর ইবনুল আস (রা.)

(আত-তাবারি; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ)

কিন্তু রোমান বাহিনীর বিশাল সমাবেশের সংবাদ পেয়ে আবু বকর (রা.) ইরাক থেকে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (রা.)-কে শামের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন।

খালিদ (রা.) মরুভূমির একটি কঠিন ও অপ্রচলিত পথ অতিক্রম করে অল্প সময়ে শামে পৌঁছে যান। তাঁর এ অভিযাত্রা সামরিক ইতিহাসে এক অসাধারণ কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়।

এরপর মুসলিম বাহিনী একত্রিত হয়ে রোমানদের বিরুদ্ধে আরও সুসংগঠিতভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

আবু বকর (রা.) তাঁর সেনাপতিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছিলেন,

> "আল্লাহর সাহায্যের ওপর ভরসা করো। ধৈর্য ধারণ করো। কারণ ধৈর্যই বিপদের সময় মানুষের সর্বোত্তম সহায়।"

— আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

অর্থ

"হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, ধৈর্যে অটল থাকো, সর্বদা প্রস্তুত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।"

— সূরা আলে ইমরান, ৩:২০০

আবু বকর (রা.)-এর যুগে ইরাক ও শাম অভিযানের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বিস্তারের ভিত্তি স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর খিলাফতের সময় এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই ইয়ারমুক ও কাদিসিয়ার মতো ঐতিহাসিক বিজয় অর্জিত হয়।

এই পর্ব আমাদের শেখায়, ইসলামের ইতিহাসে বিজয়ের মূল কারণ ছিল না সংখ্যাধিক্য বা পার্থিব শক্তি; বরং ঈমান, ন্যায়বিচার, শৃঙ্খলা এবং আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) যেখানেই গিয়েছেন, সেখানে শুধু বিজয় নয়, ন্যায়, নিরাপত্তা ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠারও চেষ্টা করেছেন।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
আবু বকর (রা.)-এর শেষ দিনগুলো, উমর (রা.)-কে উত্তরসূরি মনোনয়ন এবং একজন মহান খলিফার ইন্তিকাল।

পর্ব

৬

আবু বকর (রা.)-এর শেষ দিনগুলো, উমর (রা.)-কে উত্তরসূরি মনোনয়ন এবং একজন মহান খলিফার ইন্তিকাল

হিজরতের ১৩তম বছরে, প্রায় দুই বছর তিন মাস খিলাফতের দায়িত্ব পালন করার পর আবু বকর আস-সিদ্দীক (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর অসুস্থতা কয়েকদিন স্থায়ী হয়। তিনি উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর ইন্তিকালের সময় ঘনিয়ে এসেছে।

তিনি জানতেন, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর ইন্তিকালের পর যেমন মুসলিম উম্মাহ নেতৃত্বের প্রশ্নে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল, তেমনি তাঁর ইন্তিকালের পরও যদি নেতৃত্বের বিষয়টি অনির্ধারিত থাকে, তবে আবারও মতভেদ ও অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে।

এ কারণে তিনি একক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে না দিয়ে প্রথমে সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গে পরামর্শ (শূরা) শুরু করেন।

তিনি আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা.), উসমান ইবন আফফান (রা.), আলী ইবন আবি তালিব (রা.), সাঈদ ইবন যায়েদ (রা.)সহ বিশিষ্ট সাহাবিদের মতামত নেন। অধিকাংশ সাহাবিই উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-কে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করেন। (তারীখ আত-তাবারি; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ)

কেউ কেউ উমর (রা.)-এর কঠোর স্বভাবের কথা উল্লেখ করলে আবু বকর (রা.) বললেন,

> "তোমরা যে কঠোরতা দেখছ, তা এই কারণে যে, আমি কোমল। যখন শাসনের দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পিত হবে, তখন তিনি আরও ভারসাম্যপূর্ণ হবেন।"

এরপর তিনি উসমান ইবন আফফান (রা.)-কে ডেকে একটি লিখিত ঘোষণাপত্র লিপিবদ্ধ করান। তাতে তিনি উমর (রা.)-কে পরবর্তী খলিফা হিসেবে মনোনীত করেন।

এরপর তিনি জনগণকে সমবেত করে বলেন,

> "আমি আমার আত্মীয়কে নয়, বরং তোমাদের মধ্যে যাকে সর্বাধিক যোগ্য মনে করেছি, তাকেই তোমাদের দায়িত্বশীল হিসেবে মনোনীত করেছি। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট ?"

লোকেরা বললেন,

> "জি, আমরা সন্তুষ্ট।"
>
> — আত-তাবারি; ইবন কাসির

আবু বকর (রা.) তখন আল্লাহর কাছে আন্তরিক দোয়া করলেন,

> "হে আল্লাহ! আমি তাদের কল্যাণ কামনা করেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। তাদের ওপর এমন একজনকে দায়িত্ব দিয়েছি, যাকে আমি তাদের জন্য সর্বোত্তম মনে করি।"

অসুস্থতার দিনগুলোতেও তিনি রাষ্ট্রের কাজকর্মের খোঁজখবর নিতেন এবং মুসলিমদের কল্যাণ নিয়ে চিন্তা করতেন।

তিনি অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন, যেন রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকে তাঁর ব্যক্তিগত কোনো প্রয়োজন পূরণ না হয়।

তিনি ওসিয়ত করেন, খিলাফতের সময় তাঁর ব্যবহৃত রাষ্ট্রীয় উট, দাস এবং একটি কাপড় বিক্রি করে তার মূল্য বায়তুল মালে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তাঁর ইন্তিকালের পর এ নির্দেশ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। (মুসান্নাফ ইবন আবি শাইবাহ; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ)

২২ জমাদিউল আখির, ১৩ হিজরি (৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ) আবু বকর আস-সিদ্দীক (রা.) ৬৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁর খিলাফতের মেয়াদ ছিল প্রায় দুই বছর তিন মাস।

তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে সেই কাপড়েই কাফন দেওয়া হয়, যা তিনি ব্যবহার করতেন। অতিরিক্ত জাঁকজমকপূর্ণ কাফনের প্রয়োজন তিনি মনে করেননি।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) তাঁর জানাজার সালাতের ইমামতি করেন।

এরপর তাঁকে মদিনায় রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর রওজা মুবারকের পাশে, উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা.)-এর কক্ষে দাফন করা হয়। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ১৩৯২; ঐতিহাসিক সূত্র)

আবু বকর (রা.)-এর খিলাফত ছিল সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তাঁর সময়ে—

রিদ্দার ফিতনা দমন হয়।

যাকাতব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

মিথ্যা নবীদের পরাজিত করা হয়।

কুরআন প্রথমবারের মতো একত্রে সংকলিত হয়।

উসামাহ (রা.)-এর বাহিনী প্রেরিত হয়।

ইরাক ও শাম বিজয়ের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে বলেছেন,

> "আমার উম্মতের প্রতি সবচেয়ে বেশি দয়াশীল ব্যক্তি হলেন আবু বকর।"
>
> — সুনান আত-তিরমিযি, হাদিস: ৩৭৯০; সহিহ

আর তিনি আরও বলেছেন,

> "আমি যদি আমার রব ছাড়া অন্য কাউকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু (খলীল) বানাতাম, তবে অবশ্যই আবু বকরকেই বানাতাম।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৬৫৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৩৮২

আবু বকর (রা.)-এর জীবন আমাদের শেখায়—সত্যবাদিতা, তাওয়াক্কুল, বিনয়, ন্যায়বিচার এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল صلى الله عليه وسلم-এর আনুগত্যের ওপর অটল থাকাই একজন প্রকৃত মুমিন ও নেতার পরিচয়।

তাঁর দৃঢ় নেতৃত্ব না থাকলে রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর ইন্তিকালের পর মুসলিম উম্মাহ ভয়াবহ সংকটে পড়তে পারত। আল্লাহ তাআলা তাঁকে উম্মাহর ঐক্য ও দ্বীন সংরক্ষণের এক মহান মাধ্যম হিসেবে কবুল করেছিলেন।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.): ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা, ন্যায়বিচারের প্রতীক এবং এক নতুন যুগের সূচনা।

দ্বিতীয় খলিফা

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)

বিজয়, ন্যায়বিচার, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাহাদাত

পর্ব ৭ – ১৩

পর্ব

৭

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা, ন্যায়বিচারের প্রতীক এবং এক নতুন যুগের সূচনা

আবু বকর আস-সিদ্দীক (রা.)-এর ইন্তিকালের পর হিজরতের ১৩তম বছরে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) মুসলিম উম্মাহর দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল উমর ইবনুল খাত্তাব ইবন নুফাইল আল-আদাভী আল-কুরাইশী (রা.)। ইসলাম গ্রহণের আগে তিনি কুরাইশদের অন্যতম প্রভাবশালী ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তিনি তাঁর সাহস, প্রজ্ঞা ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর দ্বীনের জন্য উৎসর্গ করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ইসলাম গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন,

> «اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ: بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ»

অর্থ

"হে আল্লাহ! আবু জাহল অথবা উমর ইবনুল খাত্তাব—এই দুজনের মধ্যে যিনি আপনার কাছে অধিক প্রিয়, তাঁর মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করুন।"

— সুনান আত-তিরমিযি, হাদিস: ৩৬৮১; হাসান

আল্লাহ তাআলা উমর (রা.)-এর মাধ্যমে এ দোয়া কবুল করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ মুসলিমদের জন্য এক নতুন শক্তির উৎস হয়ে ওঠে। এরপর মুসলিমরা প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে কাবা

শরিফে গিয়ে সালাত আদায় করেন।

খলিফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর উমর (রা.) প্রথম ভাষণে আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং মানুষকে তাকওয়া ও ন্যায়বিচারের উপদেশ দেন।

তিনি বলেন,

> "হে মানুষ! আমি কঠোর ছিলাম, কিন্তু এখন আমি দুর্বলদের প্রতি কোমল এবং জালিমদের প্রতি কঠোর থাকব। আমি চেষ্টা করব, যেন কারও অধিকার নষ্ট না হয়।"
>
> — তারীখ আত-তাবারি; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ

উমর (রা.)-এর শাসনের মূল ভিত্তি ছিল আদল (ন্যায়বিচার)।

তিনি বিশ্বাস করতেন, একজন শাসকের প্রথম দায়িত্ব হলো মানুষের হক আদায় করা এবং জুলুম দূর করা।

তিনি প্রায়ই রাতের অন্ধকারে ছদ্মবেশে মদিনার অলিগলি ঘুরে মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন। কোথাও কোনো অভাবী, ক্ষুধার্ত বা অসহায় মানুষ আছে কি না, তা নিজেই খোঁজ নিতেন।

একবার তিনি একটি পরিবারের কান্নার শব্দ শুনতে পান। কাছে গিয়ে দেখলেন, একটি হাঁড়িতে শুধু পানি ফুটছে। ক্ষুধার্ত শিশুদের শান্ত রাখার জন্য তাদের মা এমনটি করছিলেন।

এ দৃশ্য দেখে উমর (রা.) কেঁদে ফেললেন। তিনি নিজেই বায়তুল মাল থেকে খাদ্যসামগ্রী কাঁধে বহন করে নিয়ে গেলেন।

তাঁর খাদেম বললেন,

> "আমি বহন করি।"

উমর (রা.) উত্তর দিলেন,

> "কিয়ামতের দিন কি তুমি আমার বোঝা বহন করবে?"

অতঃপর তিনি নিজ হাতে রান্না করে শিশুদের খাওয়ালেন এবং তারা হাসতে শুরু না করা পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করলেন। (আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ; সিফাতুস সাফওয়াহ)

উমর (রা.)-এর যুগে ইসলামী রাষ্ট্র দ্রুত সম্প্রসারিত হতে থাকে। তবে তিনি বারবার সেনাপতিদের নির্দেশ দিতেন, যেন যুদ্ধের সময় নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও নিরস্ত্র মানুষকে কষ্ট না দেওয়া

হয় এবং কোনো প্রকার জুলুম না করা হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾

অর্থ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার, সদাচার এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন।"

— সূরা আন-নাহল, ১৬:৯০

উমর (রা.)-এর পুরো শাসনকাল ছিল এ আয়াতের এক বাস্তব প্রতিফলন।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে বলেছেন,

> "আমার পরে যদি কোনো নবী হতো, তবে সে হতো উমর ইবনুল খাত্তাব।"
>
> — সুনান আত-তিরমিযি, হাদিস: ৩৬৮৬; হাসান

তিনি আরও বলেছেন,

> "নিশ্চয়ই আল্লাহ উমরের অন্তর ও জিহ্বায় সত্যকে স্থাপন করেছেন।"
>
> — সুনান আত-তিরমিযি, হাদিস: ৩৬৮২; সহিহ

উমর (রা.)-এর খিলাফত ইসলামের ইতিহাসে ন্যায়বিচার, সুশাসন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তাঁর সময়েই ইসলামী রাষ্ট্র একটি সুসংগঠিত প্রশাসনিক কাঠামো লাভ করে এবং বিশ্বসভায় এক শক্তিশালী ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই পর্ব আমাদের শেখায়, প্রকৃত নেতৃত্ব ক্ষমতার অহংকারে নয়; বরং আল্লাহভীতি, ন্যায়বিচার, জবাবদিহিতা এবং মানুষের কল্যাণে নিবেদিত থাকার মধ্যেই নিহিত।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:

ইয়ারমুকের বিজয় — রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক যুদ্ধ এবং শাম অঞ্চলে ইসলামের প্রতিষ্ঠা

পর্ব

৮

ইয়ারমুকের বিজয়

রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক যুদ্ধ এবং শাম অঞ্চলে ইসলামের প্রতিষ্ঠা

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের কিছুদিন পর মুসলিম রাষ্ট্রের সামনে সবচেয়ে বড় সামরিক চ্যালেঞ্জগুলোর একটি উপস্থিত হয়।

রোমান (বাইজেন্টাইন) সম্রাট হিরাক্লিয়াস শাম অঞ্চল পুনর্দখলের উদ্দেশ্যে একটি বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করেন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনায় সৈন্যসংখ্যা ভিন্নভাবে উল্লেখ হয়েছে, তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রোমান বাহিনী সংখ্যায় মুসলিমদের তুলনায় অনেক বড় ছিল।

মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)। আর যুদ্ধক্ষেত্রে প্রধান সামরিক কৌশলের দায়িত্ব পালন করেন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (রা.), যিনি তাঁর অসাধারণ নেতৃত্ব ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে মুসলিম বাহিনীকে সুসংগঠিত করেন।

যুদ্ধের আগে মুসলিমরা শত্রুদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। তারা জানিয়ে দেন, যুদ্ধ তাদের উদ্দেশ্য নয়; বরং মানুষের কাছে আল্লাহর দ্বীন পৌঁছে দেওয়া এবং জুলুমের অবসান ঘটানোই তাদের লক্ষ্য।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

অর্থ

"হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করো, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় করবেন।"

— সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭:৭

১৫ হিজরিতে ইয়ারমুক প্রান্তরে কয়েক দিনব্যাপী তীব্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (রা.) অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মুসলিম বাহিনীকে পরিচালনা করেন। তাঁর পরিকল্পনার ফলে মুসলিমদের বিভিন্ন বাহিনী পরস্পরের সহযোগিতায় যুদ্ধ চালিয়ে যায় এবং রোমানদের বড় বড় আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়।

মুসলিম বাহিনীর ঈমান, ধৈর্য ও শৃঙ্খলা তাদের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল।

অবশেষে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের এক ঐতিহাসিক বিজয় দান করেন।

রোমান বাহিনী পরাজিত হয়ে শাম অঞ্চল থেকে পিছু হটে। এই বিজয়ের ফলে দামেস্ক, হিমস, জর্দান এবং পরবর্তীতে সমগ্র শাম অঞ্চলে ইসলামী রাষ্ট্রের অবস্থান সুদৃঢ় হয়ে ওঠে।

এই বিজয়ের সংবাদ পেয়ে উমর (রা.) আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন এবং সেনাপতিদের অহংকার থেকে সতর্ক থাকতে বলেন।

তিনি সবসময় স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, বিজয় মানুষের শক্তির কারণে নয়; বরং আল্লাহর সাহায্যের কারণেই আসে।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন,

> "আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে তিনি দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৭১ ; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১০৩৭

সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এই জ্ঞানের আলোতেই যুদ্ধ, রাষ্ট্র পরিচালনা ও মানুষের সঙ্গে আচরণ করতেন। তাই তাঁদের বিজয় শুধু ভূখণ্ডের বিজয় ছিল না; বরং ন্যায়বিচার, নিরাপত্তা এবং ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রতিষ্ঠারও বিজয় ছিল।

ইয়ারমুকের বিজয় ইসলামের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এর মাধ্যমে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শক্তিশালী রোমান সাম্রাজ্যের শাম অঞ্চলে আধিপত্যের অবসান ঘটে এবং ইসলামের প্রসারের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

এই পর্ব আমাদের শেখায়, ঈমান, ধৈর্য, শৃঙ্খলা এবং আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল থাকলে বড় থেকে বড় চ্যালেঞ্জও অতিক্রম করা সম্ভব। প্রকৃত বিজয় আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে, আর মুমিনের দায়িত্ব হলো তাঁর নির্দেশ মেনে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
কাদিসিয়ার যুদ্ধ ও পারস্য বিজয়ের সূচনা — সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর নেতৃত্ব, রুস্তমের পরাজয় এবং সাসানীয় সাম্রাজ্যের পতনের শুরু।

পর্ব

৯

কাদিসিয়ার যুদ্ধ ও পারস্য বিজয়ের সূচনা

সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর নেতৃত্ব, রুস্তমের পরাজয় এবং সাসানীয় সাম্রাজ্যের পতনের শুরু

ইয়ারমুকের ঐতিহাসিক বিজয়ের পর ইসলামী রাষ্ট্রের সামনে আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল সাসানীয় পারস্য সাম্রাজ্য।

পারস্য সম্রাট ইয়াযদেগার্দ তৃতীয় মুসলিমদের অগ্রযাত্রা থামানোর জন্য বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করেন। তাঁর প্রধান সেনাপতি ছিলেন রুস্তম ফাররুখযাদ, যিনি পারস্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামরিক নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) প্রথমে নিজেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আলী ইবন আবি তালিব (রা.), উসমান ইবন আফফান (রা.), আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা.)সহ জ্যেষ্ঠ সাহাবিগণ তাঁকে পরামর্শ দেন, যেন তিনি মদিনায় থেকেই সমগ্র মুসলিম রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দেন।

তিনি সাহাবিদের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সেনাপতি হিসেবে মনোনীত করেন সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-কে। (তারীখ আত-তাবারি; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ)

সা'দ (রা.) ছিলেন ইসলামের প্রথমদিকের মুসলিমদের একজন এবং জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবির অন্তর্ভুক্ত।

যুদ্ধ শুরুর আগে উমর (রা.) তাঁকে লিখলেন,

> "তোমার সৈন্যসংখ্যা বা শক্তির ওপর নয়, আল্লাহর ওপর ভরসা করো। আল্লাহর আনুগত্যই বিজয়ের সবচেয়ে বড় কারণ।"
>
> — আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ

মুসলিম বাহিনী ইরাকের কাদিসিয়া প্রান্তরে পৌঁছায়।

ইসলামের নীতি অনুযায়ী যুদ্ধ শুরু করার আগে পারস্যের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া হয়।

সাহাবি রিবঈ ইবন আমির (রা.) রুস্তমের দরবারে প্রবেশ করেন। রুস্তম তাঁকে জিজ্ঞাসা করল,

> "তোমরা কেন এসেছ?"

রিবঈ (রা.) উত্তর দিলেন,

> "আল্লাহ আমাদের পাঠিয়েছেন, যাতে আমরা মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে আল্লাহর দাসত্বের দিকে, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রশস্ততার দিকে এবং সব ভ্রান্ত ধর্মের জুলুম থেকে ইসলামের ন্যায়বিচারের দিকে নিয়ে আসি।"
>
> — আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ; আত-তাবারি

এই উত্তর ইসলামী দাওয়াতের উদ্দেশ্যকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

এরপর যুদ্ধ শুরু হয়।

কয়েক দিন ধরে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে। পারস্য বাহিনীর যুদ্ধহাতি প্রথমদিকে মুসলিমদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে। কিন্তু মুসলিম যোদ্ধারা ধীরে ধীরে কৌশল পরিবর্তন করে হাতিগুলোকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হন।

চতুর্থ দিনে যুদ্ধ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে।

প্রবল ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে মুসলিম বাহিনী সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ চালায়।

এ সময় রুস্তম নিহত হয় এবং তার পতাকার নিয়ন্ত্রণও মুসলিমদের হাতে চলে আসে।

সেনাপতির মৃত্যুর পর পারস্য বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং তারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের এক ঐতিহাসিক বিজয় দান করেন।

এই বিজয়ের মাধ্যমে পারস্য সাম্রাজ্যের শক্তির মেরুদণ্ড ভেঙে যায়।

কাদিসিয়ার বিজয়ের পর মুসলিমরা পারস্যের রাজধানী মাদাইন (কতেসিফোন)-এর দিকে অগ্রসর হন।

সম্রাট ইয়াযদেগার্দ রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে যান এবং মুসলিমরা শান্তিপূর্ণভাবে নগরীতে প্রবেশ করেন।

মাদাইনে মুসলিমরা বিপুল ধন-সম্পদ লাভ করেন। কিন্তু সা'দ (রা.) ও সাহাবিগণ এসব সম্পদ নিজেদের জন্য গ্রহণ করেননি; বরং ইসলামী বিধান অনুযায়ী সবকিছু বায়তুল মালে জমা দেন

এবং শরিয়তের বিধান অনুযায়ী বণ্টন করেন।

উমর (রা.) এ সংবাদ শুনে আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং বলেন,

> "যে জাতি আমানত রক্ষা করে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা দান করেন।"
>
> — অর্থগতভাবে; ঐতিহাসিক বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾

অর্থ

"বিজয় তো একমাত্র পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে।"

— সূরা আলে ইমরান, ৩:১২৬

কাদিসিয়ার যুদ্ধ শুধু একটি সামরিক বিজয় ছিল না; এটি ছিল এমন এক ঐতিহাসিক ঘটনা, যার মাধ্যমে শত শত বছর ধরে প্রতিষ্ঠিত সাসানীয় সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হয়।

এই পর্ব আমাদের শেখায়, প্রকৃত শক্তি অস্ত্র বা সংখ্যায় নয়; বরং আল্লাহর আনুগত্য, সঠিক নেতৃত্ব, ধৈর্য এবং ন্যায়বিচারের মধ্যে নিহিত। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) দুনিয়া জয়ের জন্য নয়, বরং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের কাছে সত্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
বায়তুল মুকাদ্দাস (জেরুজালেম) বিজয় — উমর (রা.)-এর ঐতিহাসিক সফর, শান্তিচুক্তি এবং ন্যায়বিচারের অনন্য দৃষ্টান্ত।

পর্ব

১০

বায়তুল মুকাদ্দাস (জেরুজালেম) বিজয়

উমর (রা.)-এর ঐতিহাসিক সফর, শান্তিচুক্তি এবং ন্যায়বিচারের অনন্য দৃষ্টান্ত

হিজরতের ১৬ হিজরিতে (কিছু ঐতিহাসিকের মতে ১৫ হিজরি) মুসলিম বাহিনী শাম অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা বিজয় করে। এরপর তারা ইলিয়া (বর্তমান জেরুজালেম/বায়তুল মুকাদ্দাস) অবরোধ করে।

মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.), খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (রা.), ইয়াযিদ ইবন আবি সুফিয়ান (রা.) এবং অন্যান্য বিশিষ্ট সাহাবি।

দীর্ঘ অবরোধের পর জেরুজালেমের খ্রিস্টান নেতা প্যাট্রিয়ার্ক সফরোনিয়াস শান্তিচুক্তির মাধ্যমে শহর হস্তান্তরে সম্মত হন। তবে তিনি একটি শর্ত দেন—শহরের চাবি তিনি শুধু মুসলিমদের খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর হাতেই তুলে দেবেন।

সংবাদটি মদিনায় পৌঁছালে উমর (রা.) কোনো জাঁকজমকপূর্ণ রাজকীয় বহর নিয়ে রওনা হননি।

তিনি একটি উট এবং একজন খাদেমকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করেন। উটে পালাক্রমে দুজনই আরোহণ করতেন।

জেরুজালেমের কাছে পৌঁছানোর সময় উটে আরোহণের পালা ছিল খাদেমের, আর উমর (রা.) নিজে উটের লাগাম ধরে হেঁটে যাচ্ছিলেন।

কিছু সেনাপতি অনুরোধ করলেন,

> "হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি যদি উটে আরোহণ করতেন, তাহলে মানুষের কাছে মুসলিমদের মর্যাদা আরও বেশি প্রকাশ পেত।"

উমর (রা.) বললেন,

> "আমরা এমন এক জাতি, যাদের আল্লাহ ইসলাম দ্বারা সম্মানিত করেছেন। আমরা যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুর মাধ্যমে সম্মান খুঁজতে চাই, তবে আল্লাহ আমাদের লাঞ্ছিত করবেন।"

এই বক্তব্যটি ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে প্রসিদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে। এর শিক্ষা কুরআনের এ আয়াতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ—

﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾

অর্থ

"সম্মান তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদেরই।"

— সূরা আল-মুনাফিকুন, ৬৩:৮

উমর (রা.) জেরুজালেমে পৌঁছালে প্যাট্রিয়ার্ক সফরোনিয়াস তাঁর হাতে শহরের চাবি তুলে দেন।

এরপর একটি ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়, যা "উমরিয়াহ চুক্তি" নামে পরিচিত।

এ চুক্তিতে উমর (রা.) জেরুজালেমের অধিবাসীদের জান-মাল, গির্জা, উপাসনালয় এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন।

তিনি ঘোষণা করেন যে, কোনো গির্জা ধ্বংস করা হবে না, কারও ধর্ম পালনে বাধা দেওয়া হবে না এবং কারও সম্পদ অন্যায়ভাবে কেড়ে নেওয়া হবে না। (তারীখ আত-তাবারি; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ)

জেরুজালেম সফরের সময় নামাজের সময় হলে প্যাট্রিয়ার্ক তাঁকে চার্চ অব দ্য হলি সেপালকার-এর ভেতরে সালাত আদায় করার আমন্ত্রণ জানান।

কিন্তু উমর (রা.) তা গ্রহণ করলেন না।

তিনি বাইরে এসে সালাত আদায় করলেন এবং বললেন,

> "আমি যদি গির্জার ভেতরে সালাত আদায় করতাম, তাহলে ভবিষ্যতে মুসলিমরা এটিকে অজুহাত বানিয়ে গির্জাটিকে মসজিদে পরিণত করতে পারত।"

এভাবে তিনি অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়ের অধিকারও বাস্তবে সংরক্ষণ করেন। (তারীখ আত-তাবারি; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ)

এরপর উমর (রা.) বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকায় যান।

দীর্ঘদিনের অবহেলায় সেখানে ময়লা-আবর্জনা জমে ছিল।

তিনি নিজ হাতে সেই স্থান পরিষ্কার করতে শুরু করেন।

তাঁর সঙ্গে সাহাবিরাও এ কাজে অংশ নেন।

পরবর্তীতে সেখানে একটি সাধারণ সালাতের স্থান নির্মাণ করা হয়, যা পরবর্তীকালে আরও উন্নত ও সম্প্রসারিত হয়।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বায়তুল মুকাদ্দাসের ফজিলত সম্পর্কে বলেছেন,

> "তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদে (বিশেষ সওয়াবের উদ্দেশ্যে) সফর করা উচিত নয়—মসজিদুল হারাম, আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববী) এবং মসজিদুল আকসা।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ১১৮৯; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৩৯৭

বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় ছিল ইসলামের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা।

এটি কেবল একটি শহর বিজয় ছিল না; বরং ন্যায়বিচার, ধর্মীয় সহনশীলতা এবং আমানতদারিতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

উমর (রা.) তাঁর আচরণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছিলেন যে, ইসলামের বিজয় মানে প্রতিশোধ নয়; বরং মানুষের অধিকার সংরক্ষণ এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা।

এই পর্ব আমাদের শেখায়, একজন প্রকৃত মুসলিম শাসক ক্ষমতা লাভের পর প্রতিপক্ষের ওপর জুলুম করেন না; বরং ন্যায়বিচার, দয়া এবং আমানতদারিতার মাধ্যমে মানুষের হৃদয় জয় করেন।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:

উমর (রা.)-এর রাষ্ট্রব্যবস্থা ও প্রশাসনিক সংস্কার: বায়তুল মাল, হিজরি সন, বিচারব্যবস্থা, শূরা এবং কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

পর্ব

১১

উমর (রা.)-এর রাষ্ট্রব্যবস্থা ও প্রশাসনিক সংস্কার

ইসলামী রাষ্ট্রের সুসংগঠিত ভিত্তি ও ন্যায়ভিত্তিক শাসনের প্রতিষ্ঠা

বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের পর ইসলামী রাষ্ট্র দ্রুত বিস্তৃত হতে থাকে। শাম, ইরাক, পারস্য ও মিসরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুসলিম শাসনের অধীনে চলে আসে। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই ইসলামী রাষ্ট্র পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

এত বিশাল রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য শুধু বিজয় অর্জনই যথেষ্ট ছিল না। নতুন নতুন শহর, বিভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভাষা এবং বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য একটি সুসংগঠিত প্রশাসনের প্রয়োজন ছিল।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এ বাস্তবতা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি রাষ্ট্র পরিচালনায় এমন কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, যা ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

তিনি ইসলামী রাষ্ট্রকে কয়েকটি প্রশাসনিক প্রদেশে বিভক্ত করেন এবং প্রতিটি প্রদেশে যোগ্য ও বিশ্বস্ত গভর্নর নিয়োগ দেন। তবে তাঁদের তিনি কখনো সীমাহীন ক্ষমতা দেননি। নিয়মিত তাঁদের কাজের হিসাব নিতেন এবং জনগণের অভিযোগ সরাসরি শুনতেন। কোনো গভর্নরের বিরুদ্ধে অন্যায়ের অভিযোগ প্রমাণিত হলে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।

রাষ্ট্রীয় সম্পদ সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু বণ্টনের জন্য তিনি বায়তুল মালকে আরও সুসংগঠিত করেন। যাকাত, জিযিয়া, খারাজ, গনীমতের সম্পদ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় আয় সেখানে জমা হতো। এরপর ইসলামী বিধান অনুযায়ী দরিদ্র, এতিম, বিধবা, ঋণগ্রস্ত এবং অন্যান্য হকদারদের মাঝে তা বণ্টন করা হতো।

রাষ্ট্রের কাজকর্ম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারি নথিপত্রে তারিখ নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। তখন সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর সঙ্গে পরামর্শের পর উমর (রা.) হিজরতের ঘটনাকে ইসলামী বর্ষপঞ্জির সূচনা হিসেবে নির্ধারণ করেন। এভাবেই হিজরি সনের প্রচলন হয়, যা আজও মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয় বর্ষপঞ্জি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

তিনি বিচারব্যবস্থার প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব দেন। বিভিন্ন অঞ্চলে পৃথক বিচারক নিয়োগ করা হয়, যাতে মানুষ দ্রুত ও নিরপেক্ষ বিচার পায়। বিচারকদের তিনি বারবার স্মরণ করিয়ে দিতেন, বিচারকের কাছে ধনী-গরিব, শাসক-প্রজা—সকলেই সমান।

একই সঙ্গে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনায় শূরা (পরামর্শ) নীতিকে আরও সুদৃঢ় করেন। গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত তিনি এককভাবে গ্রহণ করতেন না; বরং মুহাজির ও আনসারদের জ্যেষ্ঠ সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করেই সিদ্ধান্ত নিতেন। এভাবেই ইসলামী রাষ্ট্রে জবাবদিহিতা ও পরামর্শভিত্তিক শাসন আরও শক্তিশালী হয়।

উমর (রা.) জনকল্যাণমূলক কাজেও বিশেষ গুরুত্ব দেন। বিভিন্ন অঞ্চলে রাস্তা নির্মাণ, খাল খনন, ভ্রমণকারীদের জন্য বিশ্রামাগার এবং প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। দরিদ্র, এতিম, বিধবা, বৃদ্ধ এবং অসহায় মানুষের জন্য নিয়মিত রাষ্ট্রীয় সহায়তার ব্যবস্থাও চালু করা হয়।

একবার তিনি এক বৃদ্ধ অমুসলিমকে মানুষের কাছে সাহায্য চাইতে দেখলেন। তাঁর অবস্থা জানতে পেরে উমর (রা.) নির্দেশ দিলেন, বায়তুল মাল থেকে তাঁর জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা হোক। তিনি মনে করতেন, ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তায় বসবাসকারী প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। (আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ)

রাষ্ট্রের কাজ যতই বৃদ্ধি পাক, উমর (রা.) নিজের জীবনযাত্রায় কোনো পরিবর্তন আনেননি। তিনি আগের মতোই সাধারণ পোশাক পরতেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতেন এবং প্রয়োজন হলে রাতের অন্ধকারে মদিনার পথে পথে ঘুরে মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন।

তাঁর শাসনামলে ইসলামী রাষ্ট্র শুধু ভূখণ্ডের দিক থেকেই নয়, প্রশাসন, ন্যায়বিচার এবং জনকল্যাণের দিক থেকেও নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যায়। পরবর্তী যুগের মুসলিম শাসকরাও তাঁর প্রতিষ্ঠিত অনেক প্রশাসনিক নীতি অনুসরণ করেন।

এই পর্ব আমাদের সামনে উমর (রা.)-এর এমন এক দিক তুলে ধরে, যা প্রমাণ করে—তিনি শুধু একজন বিজয়ী সেনানায়ক ছিলেন না; তিনি ছিলেন একজন দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক, যিনি ইসলামী রাষ্ট্রকে শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:

আমওয়াসের মহামারি ও উমর (রা.)-এর নেতৃত্ব — আবু উবাইদাহ (রা.)-এর শাহাদাত, দুর্যোগ মোকাবিলা এবং তাকদির সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা।

পর্ব

১২

আমওয়াসের মহামারি ও উমর (রা.)-এর নেতৃত্ব

আবু উবাইদাহ (রা.)-এর শাহাদাত, দুর্যোগ মোকাবিলা এবং তাকদির সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা

ইসলামী রাষ্ট্র যখন শাম, ইরাক, মিসর ও পারস্যে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, ঠিক তখনই মুসলিম উম্মাহ এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। ১৮ হিজরিতে শাম অঞ্চলের আমওয়াস নামক স্থানে এক ভয়াবহ মহামারির প্রাদুর্ভাব ঘটে। অল্প সময়ের মধ্যেই তা পুরো অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে।

এ সময় উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) শাম সফরের উদ্দেশ্যে মদিনা থেকে রওনা হন। তিনি যখন সারগ নামক স্থানে পৌঁছান, তখন সেনাপতি আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.) এবং শামের অন্যান্য নেতারা তাঁকে মহামারির সংবাদ জানান।

উমর (রা.) সঙ্গে সঙ্গে মুহাজির ও আনসারদের জ্যেষ্ঠ সাহাবিদের নিয়ে পরামর্শ করেন। দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয়, মুসলিমদের স্বার্থে তিনি শামে প্রবেশ করবেন না; বরং মদিনায় ফিরে যাবেন। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৫৭২৯; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২২১৯)

এ সিদ্ধান্তের কথা শুনে আবু উবাইদাহ (রা.) বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন,

> "আপনি কি আল্লাহর তাকদির থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন?"

উমর (রা.) জবাব দিলেন,

> "আমরা আল্লাহর এক তাকদির থেকে তাঁরই আরেক তাকদিরের দিকে যাচ্ছি।"

— সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৫৭২৯

এ সময় আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা.) উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> "যখন তোমরা কোনো এলাকায় মহামারির কথা শুনবে, তখন সেখানে প্রবেশ করবে না। আর যদি তোমরা এমন এলাকায় অবস্থান কর, যেখানে মহামারি দেখা দিয়েছে, তাহলে সেখান থেকে বের হয়ো না।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৫৭২৮; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২২১৯

এ হাদিস শোনার পর উমর (রা.) আল্লাহর প্রশংসা করেন। তাঁর সিদ্ধান্ত যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশনার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, তা স্পষ্ট হয়ে যায়।

মহামারি ক্রমেই ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশ্বস্ত সাহাবি আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.) এ রোগে আক্রান্ত হন।

উমর (রা.) তাঁর প্রতি গভীর ভালোবাসা অনুভব করতেন। তিনি চিঠি লিখে আবু উবাইদাহ (রা.)-কে মদিনায় ফিরে আসার অনুরোধ জানান। কিন্তু আবু উবাইদাহ (রা.) বুঝতে পারেন, খলিফা তাঁকে মহামারির এলাকা থেকে সরিয়ে আনতে চান। তিনি বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দেন যে, তিনি তাঁর সৈন্যদের ছেড়ে চলে যেতে চান না; তাদের সঙ্গে থাকবেন এবং আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন, তাই হবে। (আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ; তারীখ আত-তাবারি)

কিছুদিন পর আবু উবাইদাহ (রা.) শাহাদাতবরণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৫৮ বছর। মৃত্যুর আগে তিনি মুসলিমদের উদ্দেশে তাকওয়া, সালাত, যাকাত, রমজানের সিয়াম, সদকা এবং পারস্পরিক ঐক্য বজায় রাখার উপদেশ দেন।

আবু উবাইদাহ (রা.)-এর শাহাদাতের পর মু'আয ইবন জাবাল (রা.) নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তিনিও মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে ইন্তিকাল করেন। পরে ইয়াযিদ ইবন আবি সুফিয়ান (রা.)-ও একই মহামারিতে ইন্তিকাল করেন। এভাবে ইসলামের বহু বিশিষ্ট সাহাবি এ দুর্যোগে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন।

শামের সংবাদ মদিনায় পৌঁছালে উমর (রা.) গভীরভাবে মর্মাহত হন। তিনি শহিদ সাহাবিদের জন্য দোয়া করেন এবং আক্রান্ত অঞ্চলের মানুষের সহায়তায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। একই সঙ্গে তিনি প্রশাসনিকভাবে নতুন দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নিয়োগ দিয়ে শামের স্থিতিশীলতা বজায় রাখেন।

আমওয়াসের মহামারি মুসলিম উম্মাহর জন্য ছিল এক কঠিন পরীক্ষা। কিন্তু এ ঘটনার মাধ্যমে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) শিখিয়েছেন, আল্লাহর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখার অর্থ এই নয় যে, মানুষ প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করবে না। বরং শরিয়তের নির্দেশনা মেনে যথাসাধ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং তারপর আল্লাহর ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকাই একজন মুমিনের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:

উমর (রা.)-এর শাহাদাত — আবু লুলুর আক্রমণ, শেষ উপদেশ, শূরা পরিষদ গঠন এবং এক মহান খলিফার বিদায়।

পর্ব

১৩

উমর (রা.)-এর শাহাদাত

আবু লুলুর আক্রমণ, শেষ উপদেশ, শূরা পরিষদ গঠন এবং এক মহান খলিফার বিদায়

আমওয়াসের মহামারির পরও উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) আগের মতোই নিষ্ঠার সঙ্গে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করতে থাকেন। তাঁর শাসনামলে ন্যায়বিচার, জবাবদিহিতা এবং জনকল্যাণের যে ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা মুসলিম উম্মাহকে আরও সুসংগঠিত করে তোলে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর এই মহান বান্দার জন্য ভিন্ন এক পরিণতি নির্ধারণ করে রেখেছিলেন।

উমর (রা.) প্রায়ই আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন,

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ

অর্থ

“হে আল্লাহ! আমাকে আপনার পথে শাহাদাত দান করুন এবং আমার মৃত্যু আপনার রাসূলের নগরীতে দান করুন।”

— সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ১৮৯০

২৩ হিজরির জিলহজ মাসে একদিন ফজরের সালাতের জন্য মুসল্লিরা মসজিদে নববীতে সমবেত হন। উমর (রা.) যথারীতি ইমামতি শুরু করেন। সালাতের মাঝখানে হঠাৎ আবু লুলু ফিরোজ

নামে এক অগ্নিপূজক দাস বিষমাখানো দ্বিমুখী ছুরি দিয়ে তাঁর ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। পরপর কয়েকটি আঘাতে উমর (রা.) গুরুতর আহত হন।

এরপর আতঙ্কিত অবস্থায় পালাতে গিয়ে আবু লুলু আরও কয়েকজন মুসল্লিকে আঘাত করে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন শাহাদাতবরণ করেন এবং অনেকে আহত হন। অবশেষে ধরা পড়ার উপক্রম হলে সে নিজেই আত্মহত্যা করে। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৭০০)

রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে যাওয়ার পরও উমর (রা.)-এর প্রথম চিন্তা ছিল সালাত। তিনি আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা.)-কে ইশারা করলেন সামনে এসে ইমামতি করার জন্য। আবদুর রহমান (রা.) সংক্ষিপ্তভাবে সালাত সম্পন্ন করেন এবং মুসল্লিরা গভীর শোকের মধ্যে সালাত শেষ করেন। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৭০০)

উমর (রা.)-কে তাঁর ঘরে নিয়ে যাওয়া হলে কিছুক্ষণ পর তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে। তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন,

> “মানুষ কি সালাত আদায় করেছে?”

যখন তাঁকে জানানো হলো যে, মুসল্লিরা সালাত সম্পন্ন করেছেন, তখন তিনি শান্ত হন।

এরপর তিনি জানতে চাইলেন, কে তাঁকে আঘাত করেছে। যখন বলা হলো, আক্রমণকারী ছিল আবু লুলু নামে এক অগ্নিপূজক দাস, তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন,

> “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার মৃত্যুকে এমন ব্যক্তির হাতে নির্ধারণ করেছেন, যে ইসলামের দাবিদার নয়।”
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৭০০

চিকিৎসকেরা তাঁর ক্ষত পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন, তিনি আর সুস্থ হবেন না। এ সংবাদে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) গভীরভাবে শোকাহত হয়ে পড়েন।

তাঁরা উমর (রা.)-কে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন তাঁর পরে একজন খলিফা মনোনীত করে যান। কিন্তু উমর (রা.) অত্যন্ত প্রজ্ঞার সঙ্গে বিষয়টি বিবেচনা করলেন। তিনি বললেন,

> “যদি আমি কাউকে মনোনীত করি, তবে আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি (আবু বকর রা.) তা করেছেন। আর যদি কাউকে মনোনীত না করি, তবে আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم) তা করেননি।”
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৭২১৮

অবশেষে তিনি মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বজায় রাখার জন্য একটি শূরা পরিষদ গঠন করেন। তিনি নির্দেশ দেন, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم যাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় ইন্তিকাল করেছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকে ছয়জন সাহাবি পরামর্শের মাধ্যমে পরবর্তী খলিফা নির্বাচন করবেন।

এই ছয়জন ছিলেন—উসমান ইবন আফফান (রা.), আলী ইবন আবি তালিব (রা.), আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা.), সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা.), যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.) এবং তালহা ইবন উবাইদুল্লাহ (রা.)। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৭২০৭–৭২১০)

এদিকে উমর (রা.)-এর একটি ব্যক্তিগত ইচ্ছাও ছিল। তিনি চেয়েছিলেন, মৃত্যুর পর যেন রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم এবং আবু বকর আস-সিদ্দীক (রা.)-এর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.)-কে উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা.)-এর কাছে অনুমতি চাইতে পাঠান।

আয়িশা (রা.) বললেন,

> "আমি এ স্থানটি নিজের জন্য রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আজ আমি উমরকে নিজের ওপর অগ্রাধিকার দিলাম।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ১৩৯২

২৬ জিলহজ, ২৩ হিজরিতে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) শাহাদাতবরণ করেন। তাঁর জানাজার সালাত আদায়ের পর তাঁকে রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم এবং আবু বকর (রা.)-এর পাশেই দাফন করা হয়। এভাবেই ইসলামের ইতিহাসের এক মহান অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে।

উমর (রা.)-এর খিলাফত ছিল প্রায় দশ বছর ছয় মাস। তাঁর শাসনামলে ইসলামী রাষ্ট্র অভূতপূর্ব বিস্তার লাভ করে, ন্যায়ভিত্তিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অসংখ্য মানুষ ইসলামের সুশাসনের সুফল লাভ করে। ইতিহাস তাঁকে শুধু একজন বিজয়ী শাসক হিসেবেই নয়, বরং ন্যায়বিচার, আমানতদারিতা ও আল্লাহভীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে স্মরণ করে।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:

উসমান ইবন আফফান (রা.)-এর খিলাফতের সূচনা — শূরা পরিষদের নির্বাচন, তৃতীয় খলিফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ এবং তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্ব।

তৃতীয় খলিফা

উসমান ইবন আফফান (রা.)

বিস্তার, মুসহাফ একীভূতকরণ, ফিতনা ও শাহাদাত

পর্ব ১৪ – ১৮

পর্ব

১৪

উসমান ইবন আফফান (রা.)-এর খিলাফতের সূচনা

শূরা পরিষদের নির্বাচন, তৃতীয় খলিফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ এবং তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্ব

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর শাহাদাতের পর মুসলিম উম্মাহর সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল —পরবর্তী খলিফা কে হবেন?

উমর (রা.)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী ছয় সদস্যের শূরা পরিষদ এ দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাঁরা ছিলেন উসমান ইবন আফফান (রা.), আলী ইবন আবি তালিব (রা.), আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা.), সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা.), যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.) এবং তালহা ইবন উবাইদুল্লাহ (রা.)। তালহা (রা.) সে সময় মদিনায় উপস্থিত না থাকলেও শূরার সদস্য হিসেবে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা.) নিজের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নিরপেক্ষভাবে পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর তিনি কয়েক দিন ধরে মুহাজির ও আনসার, বদরযোদ্ধা, প্রবীণ সাহাবি, সেনাপতি এবং মদিনার সাধারণ মুসলিমদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। এমনকি নারীদের মতামতও জানার চেষ্টা করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল—মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নতুন খলিফা নির্বাচন করা। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৭২০৭–৭২১০)

অবশেষে পরামর্শের পরিধি শেষ হলে আবদুর রহমান (রা.) মসজিদে নববীতে উপস্থিত মুসলিমদের সামনে প্রথমে আলী ইবন আবি তালিব (রা.)-এর সঙ্গে কথা বলেন। এরপর উসমান ইবন আফফান (রা.)-এর সঙ্গে একই বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি উভয়ের কাছ থেকেই আল্লাহর কিতাব, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর সুন্নাহ এবং আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.)-এর অনুসৃত নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনার অঙ্গীকার গ্রহণ করেন।

এরপর তিনি উপস্থিত মুসলিমদের সামনে উসমান ইবন আফফান (রা.)-এর হাতে বাইআত করেন। সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম এবং সাধারণ মুসলিমরাও তাঁর হাতে বাইআত করেন। এভাবেই ২৩ হিজরিতে উসমান ইবন আফফান (রা.) ইসলামী রাষ্ট্রের তৃতীয় খলিফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৭২০৭–৭২১০)

উসমান (রা.) ছিলেন কুরাইশের সম্মানিত বনু উমাইয়া গোত্রের সন্তান। ইসলাম গ্রহণের প্রথম দিকেই তিনি ঈমানের সৌভাগ্য অর্জন করেন। তাঁর চরিত্র ছিল লজ্জাশীলতা, উদারতা, নম্রতা এবং ইবাদতের প্রতি গভীর অনুরাগে পরিপূর্ণ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন,

> "আমার উম্মতের মধ্যে উসমানই সর্বাধিক লজ্জাশীল।"
>
> — সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৪০১

তিনি একমাত্র সাহাবি, যাঁর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুই কন্যার বিবাহ হয়েছিল। প্রথমে রুকাইয়্যাহ (রা.)-এর সঙ্গে এবং তাঁর ইন্তিকালের পর উম্মে কুলসুম (রা.)-এর সঙ্গে। এ কারণে তিনি "যুন-নুরাইন" (দুই নূরের অধিকারী) উপাধিতে পরিচিত হন।

উসমান (রা.) ছিলেন অত্যন্ত ধনী ব্যবসায়ী। কিন্তু তাঁর সম্পদ ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি মাধ্যম। তাবুক অভিযানের সময় তিনি বিপুল পরিমাণ সম্পদ, উট এবং ঘোড়া দান করেছিলেন। তাঁর এ অবদানে সন্তুষ্ট হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> "আজকের পর উসমান যা-ই আমল করুন না কেন, তা তাঁর কোনো ক্ষতি করবে না।"
>
> — জামে আত-তিরমিযি, হাদিস: ৩৭০১; হাদিসটি হাসান বলে বহু মুহাদ্দিস গ্রহণ করেছেন।

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর উসমান (রা.) ঘোষণা করেন যে, তিনি কুরআন, সুন্নাহ এবং পূর্ববর্তী দুই খলিফার অনুসৃত ন্যায়ভিত্তিক নীতির আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। তিনি উমর (রা.)-এর প্রতিষ্ঠিত প্রশাসনিক কাঠামো বহাল রাখেন এবং গভর্নরদের নির্দেশ দেন, যেন তারা জনগণের অধিকার রক্ষা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেন।

উসমান (রা.)-এর খিলাফতের সূচনা ছিল শান্তিপূর্ণ, ঐক্যবদ্ধ এবং স্থিতিশীল। মুসলিম রাষ্ট্র তখন ভৌগোলিক বিস্তার, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং প্রশাসনিক শক্তির দিক থেকে এক অনন্য অবস্থানে পৌঁছেছিল। কিন্তু সামনে এমন কিছু ঘটনা অপেক্ষা করছিল, যা মুসলিম ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
উসমান (রা.)-এর শাসনামলে ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তার — আর্মেনিয়া, খুরাসান, উত্তর আফ্রিকা ও সমুদ্রপথে মুসলিম নৌবাহিনীর ঐতিহাসিক সাফল্য।

পর্ব

১৫

উসমান (রা.)-এর শাসনামলে ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তার

আর্মেনিয়া, খুরাসান, উত্তর আফ্রিকা ও সমুদ্রপথে মুসলিম নৌবাহিনীর ঐতিহাসিক সাফল্য

উসমান ইবন আফফান (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর ইসলামী রাষ্ট্র শান্তি ও স্থিতিশীলতার একটি পর্যায়ে প্রবেশ করে। উমর (রা.)-এর সময় প্রতিষ্ঠিত প্রশাসনিক কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু করেন। একই সঙ্গে সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে মুসলিম বাহিনীর কার্যক্রমও অব্যাহত থাকে।

তাঁর শাসনামলে ইসলামী রাষ্ট্র পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর—তিন দিকেই বিস্তার লাভ করে। তবে এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল শুধু ভূখণ্ড দখল নয়; বরং সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বিদ্রোহ দমন করা এবং ইসলামী রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।

পূর্বাঞ্চলে আবদুল্লাহ ইবন আমির (রা.)-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী পারস্যের অবশিষ্ট বিদ্রোহ দমন করে। এরপর একে একে খুরাসান, তাবারিস্তান এবং আশপাশের বহু অঞ্চল ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে আসে। পারস্যের শেষ সাসানীয় সম্রাট ইয়াযদেগার্দ তৃতীয় দীর্ঘদিন বিভিন্ন অঞ্চলে আশ্রয় নিলেও শেষ পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্যের পুনরুত্থান সম্ভব হয়নি। এর মাধ্যমে সাসানীয় সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক অধ্যায়ের কার্যত সমাপ্তি ঘটে। (তারীখ আত-তাবারি; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ)

উত্তরাঞ্চলে মুসলিম বাহিনী আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের দিকে অগ্রসর হয়। স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয় এবং অনেক অঞ্চল ইসলামী রাষ্ট্রের

অধীনে আসে। এসব অঞ্চলে চুক্তি অনুযায়ী মানুষের জান-মাল ও ধর্মীয় স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা হয়।

পশ্চিমাঞ্চলে মিসরের গভর্নর আমর ইবনুল আস (রা.)-এর পর আবদুল্লাহ ইবন সা'দ ইবন আবি সারহ (রা.) উত্তর আফ্রিকায় মুসলিম অভিযানের নেতৃত্ব দেন। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করে এবং ত্রিপোলি অতিক্রম করে আরও পশ্চিমাঞ্চলে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। অনেক এলাকার অধিবাসী শান্তিচুক্তির মাধ্যমে মুসলিম শাসন মেনে নেন।

উসমান (রা.)-এর শাসনামলের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল মুসলিম নৌবাহিনীর শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে ওঠা।

শামের গভর্নর মুয়াবিয়া ইবন আবি সুফিয়ান (রা.) দীর্ঘদিন ধরে ভূমধ্যসাগরে একটি মুসলিম নৌবাহিনী গঠনের অনুমতি চাইছিলেন। প্রথমদিকে উমর (রা.) সমুদ্রযাত্রার ঝুঁকির কারণে এতে সম্মতি দেননি। কিন্তু উসমান (রা.) পরিস্থিতি বিবেচনা করে নির্দিষ্ট শর্তে অনুমতি প্রদান করেন। তিনি নির্দেশ দেন, কাউকে জোর করে নৌ-অভিযানে অংশগ্রহণ করানো যাবে না; যারা স্বেচ্ছায় অংশ নেবে, শুধু তারাই এ অভিযানে যাবে।

এরপর মুসলিম নৌবাহিনী গঠিত হয় এবং ভূমধ্যসাগরে বাইজেন্টাইন নৌশক্তির মুখোমুখি হয়।

৩৪ হিজরিতে সংঘটিত যাতুস সাওয়ারি (Battle of the Masts)-এ মুসলিম নৌবাহিনী বাইজেন্টাইন সম্রাট দ্বিতীয় কনস্টান্সের বিশাল নৌবহরের বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করে। এ যুদ্ধের মাধ্যমে ভূমধ্যসাগরে বাইজেন্টাইনদের দীর্ঘদিনের একচ্ছত্র আধিপত্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে এবং মুসলিম নৌবাহিনীর সক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। (তারীখ আত-তাবারি; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ)

এ সময় ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা পূর্বে মধ্য এশিয়ার উপকণ্ঠ, পশ্চিমে উত্তর আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং উত্তরে আর্মেনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যায়। এত বিশাল রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য উসমান (রা.) প্রশাসনিক কাঠামো আরও শক্তিশালী করেন এবং বিভিন্ন অঞ্চলে অভিজ্ঞ গভর্নরদের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

তাঁর শাসনামলের এ ধারাবাহিক বিজয়গুলো প্রমাণ করে, ইসলামী রাষ্ট্র তখন শুধু সামরিক শক্তির কারণেই নয়; বরং সুসংগঠিত প্রশাসন, শৃঙ্খলা এবং স্থিতিশীল নেতৃত্বের কারণেও দ্রুত বিকশিত হচ্ছিল।

কিন্তু রাষ্ট্র যত বড় হতে লাগল, ততই কিছু নতুন চ্যালেঞ্জও সামনে আসতে শুরু করল। বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি, কুরআন তিলাওয়াতের বিভিন্ন কিরাআত নিয়ে মতভেদ এবং দ্রুত বিস্তৃত রাষ্ট্রে ঐক্য রক্ষা—এসব বিষয় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। উসমান (রা.) শিগগিরই এমন একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য এক অমূল্য অবদান হিসেবে বিবেচিত হবে।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
উসমান (রা.)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান — কুরআনের একক মুসহাফ প্রণয়ন, উম্মাহর ঐক্য রক্ষা এবং 'মুসহাফে উসমানী'-এর ইতিহাস।

পর্ব

১৬

উসমান (রা.)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান

কুরআনের মুসহাফ একীভূতকরণ, উম্মাহর ঐক্য রক্ষা এবং মুসহাফে উসমানীর ইতিহাস

উসমান ইবন আফফান (রা.)-এর খিলাফতের সময় ইসলামী রাষ্ট্র দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছিল। শাম, ইরাক, মিসর, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানসহ বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিমরা বসতি স্থাপন করছিলেন। নতুন নতুন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছিলেন এবং বিভিন্ন অঞ্চলের সাহাবি ও তাবেয়িদের কাছ থেকে তারা কুরআন শিখছিলেন।

কুরআন রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর ওপর বিভিন্ন স্বীকৃত কিরাআত ও আহরুফের মাধ্যমে নাজিল হয়েছিল। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) সেগুলো রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর কাছ থেকেই শিখেছিলেন। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র যখন বিভিন্ন জাতি ও ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে বিস্তৃত হলো, তখন কুরআনের পাঠ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা দেখা দিতে শুরু করে।

এক সময় হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের অভিযানে শাম ও ইরাকের মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন। সেখানে তিনি মানুষের কুরআন তিলাওয়াতের পার্থক্য লক্ষ্য করেন। এতে তিনি আশঙ্কা করলেন, বিষয়টি যদি নিয়ন্ত্রণ করা না হয়, তাহলে মুসলিমদের মধ্যে কুরআনের পাঠ নিয়ে গুরুতর বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে।

তিনি দ্রুত মদিনায় ফিরে উসমান (রা.)-এর কাছে এসে বললেন,

> "হে আমিরুল মুমিনীন! এই উম্মাহকে রক্ষা করুন, তারা যেন কিতাব নিয়ে ইহুদি ও

> খ্রিস্টানদের মতো মতভেদে লিপ্ত না হয়।"

উসমান (রা.) বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। তিনি উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা.)-এর কাছে সংবাদ পাঠিয়ে তাঁর কাছে সংরক্ষিত কুরআনের সহিফাগুলো চেয়ে পাঠালেন।

এই সহিফাগুলো ছিল সেই সংকলন, যা আবু বকর আস-সিদ্দীক (রা.)-এর খিলাফতের সময় ইয়ামামার যুদ্ধে বহু কুরআন-হাফিজ শহীদ হওয়ার পর উমর (রা.)-এর পরামর্শে সংকলিত হয়েছিল। তখন যায়দ ইবন সাবিত (রা.) অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কুরআনের লিখিত উপাদান ও সাহাবিদের মুখস্থ পাঠ যাচাই করে তা সংকলন করেছিলেন। আবু বকর (রা.)-এর পর তা উমর (রা.)-এর কাছে এবং তাঁর ইন্তিকালের পর হাফসা (রা.)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল।

হাফসা (রা.) সেই সহিফাগুলো উসমান (রা.)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

এরপর উসমান (রা.) যায়দ ইবন সাবিত (রা.), আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা.), সাঈদ ইবনুল আস (রা.) এবং আবদুর রহমান ইবন হারিস ইবন হিশাম (রা.)-কে কুরআনের মুসহাফ প্রস্তুত করার দায়িত্ব দিলেন।

তাঁদের মধ্যে যায়দ ইবন সাবিত (রা.) ছিলেন আনসারি সাহাবি এবং রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর ওহি-লেখকদের অন্যতম। অপর তিনজন ছিলেন কুরাইশি।

উসমান (রা.) তাঁদের নির্দেশ দিলেন, কোনো আরবি শব্দের লিখন বা ভাষাগত রূপ নিয়ে যায়দ (রা.)-এর সঙ্গে মতভেদ হলে তা কুরাইশের ভাষারীতি অনুযায়ী লিখতে হবে; কারণ কুরআন কুরাইশের ভাষায় নাজিল হয়েছিল।

তাঁরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সেই সহিফাগুলো থেকে একাধিক নির্ভরযোগ্য মুসহাফের কপি প্রস্তুত করলেন।

কাজ শেষ হলে উসমান (রা.) মূল সহিফাগুলো আবার হাফসা (রা.)-এর কাছে ফিরিয়ে দেন। এরপর প্রস্তুতকৃত মুসহাফের কপি ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যাতে মুসলিমরা একটি নির্ভরযোগ্য লিখিত মুসহাফ অনুসরণ করতে পারে।

একই সঙ্গে তিনি অন্যান্য ব্যক্তিগত লিখিত কপি বা বিচ্ছিন্ন লিখিত উপাদান, যেগুলো মানসম্মত মুসহাফের সঙ্গে ভিন্নভাবে লেখা ছিল, সেগুলো সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। এর

উদ্দেশ্য ছিল কুরআনের পাঠ নিয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিরোধের দরজা বন্ধ করা।

এভাবেই উসমান (রা.)-এর উদ্যোগে কুরআনের একটি মানসম্মত মুসহাফের কপি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তী যুগে এই মুসহাফগুলো মুসহাফে উসমানী নামে পরিচিত হয়।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার—উসমান (রা.) নতুন কোনো কুরআন তৈরি করেননি এবং নিজের পক্ষ থেকে কুরআনের কোনো অংশ সংযোজন বা বর্জন করেননি। বরং রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর সময় থেকে সাহাবিদের মধ্যে সংরক্ষিত কুরআনের নির্ভরযোগ্য পাঠকে একটি অভিন্ন লিখিত রূপে বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

কুরআন সংরক্ষণের এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ একটি বড় বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পায়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা মুসলিমরা একই মুসহাফের ভিত্তিতে কুরআন পাঠ করতে থাকে।

উসমান (রা.)-এর এই উদ্যোগ ইসলামের ইতিহাসে তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান হয়ে থাকে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কুরআনের পাঠকে পরিবর্তন করা নয়; বরং কুরআন নিয়ে মানুষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার আগেই তা প্রতিরোধ করা এবং উম্মাহর ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখা।

কুরআন সংরক্ষণের এ ইতিহাস আমাদের সামনে সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর সতর্কতা ও আমানতদারিতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরে। তাঁরা আল্লাহর কিতাবকে নিজেদের মতামতের বিষয় বানাননি; বরং রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর কাছ থেকে প্রাপ্ত আমানতকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে নির্ভরযোগ্যভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
উসমান (রা.)-এর খিলাফতের পরিবর্তিত পরিস্থিতি — প্রশাসনে পরিবর্তন, গভর্নরদের নিয়ে অভিযোগ, বিভিন্ন অঞ্চলে অসন্তোষের সূচনা এবং ফিতনার প্রথম বীজ।

পর্ব

১৭

উসমান (রা.)-এর খিলাফতের পরিবর্তিত পরিস্থিতি

প্রশাসনিক পরিবর্তন, গভর্নরদের নিয়ে অভিযোগ এবং ফিতনার সূচনা

মুসহাফে উসমানী বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়ার পরও উসমান ইবন আফফান (রা.)-এর খিলাফত আগের মতোই চলতে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্র তখন বিশাল আকার ধারণ করেছে। পূর্বে খুরাসান ও মধ্য এশিয়ার দিকে এবং পশ্চিমে উত্তর আফ্রিকার দিকে মুসলিমদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত ছিল।

কিন্তু রাষ্ট্র যত বিস্তৃত হতে থাকে, প্রশাসনিক সমস্যাও তত বাড়তে থাকে। মদিনা থেকে দূরের প্রদেশগুলোতে নতুন নতুন জনগোষ্ঠী ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের ভাষা, সামাজিক অবস্থা ও পূর্বের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাও ছিল ভিন্ন। ফলে কেন্দ্রের সঙ্গে প্রদেশগুলোর সম্পর্ক বজায় রাখা ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

উসমান (রা.) তাঁর খিলাফতের প্রথম কয়েক বছর উমর (রা.)-এর সময়কার প্রশাসনিক কাঠামো অনেকাংশে বজায় রাখেন। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কয়েকজন গভর্নরকে পরিবর্তন করেন এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে নিজের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের দায়িত্ব দেন।

এ সময় তাঁর আত্মীয়দের মধ্য থেকেও কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত হন। তাঁদের মধ্যে মুয়াবিয়া ইবন আবি সুফিয়ান (রা.), আবদুল্লাহ ইবন সা'দ ইবন আবি সারহ এবং আবদুল্লাহ ইবন আমির (রা.) উল্লেখযোগ্য।

এখান থেকেই পরবর্তীকালে উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে আত্মীয়প্রীতি বা স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উঠতে শুরু করে। তবে এই অভিযোগকে সরাসরি সত্য বলে গ্রহণ করা সঠিক নয়। কারণ যাঁদের তিনি নিয়োগ দিয়েছিলেন, তাঁদের সবাই তাঁর আত্মীয় ছিলেন না এবং অনেকেই এর আগেও প্রশাসনিক বা সামরিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

বিশেষ করে মুয়াবিয়া (রা.) উমর (রা.)-এর সময় থেকেই শামের গভর্নর ছিলেন এবং উসমান (রা.) তাঁকে সেই পদে বহাল রাখেন। আবদুল্লাহ ইবন আমির (রা.)-কেও তিনি পূর্বাঞ্চলের

গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেন। আবার আমর ইবনুল আস (রা.)-এর মতো অভিজ্ঞ সাহাবিদের সঙ্গে প্রশাসনিক মতপার্থক্যও দেখা দেয়।

রাষ্ট্রের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বায়তুল মালের সম্পদ ও ভূমি-রাজস্ব নিয়েও বিভিন্ন অঞ্চলে আলোচনা ও অভিযোগ বাড়তে থাকে। বিজিত অঞ্চলগুলো থেকে বিপুল সম্পদ ইসলামী রাষ্ট্রে আসছিল। কোথাও সম্পদ বণ্টন, কোথাও ভূমির মালিকানা, আবার কোথাও গভর্নরদের সিদ্ধান্ত নিয়ে মানুষের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হচ্ছিল।

এর সঙ্গে যুক্ত হয় রাজনৈতিক প্রচারণা ও গুজব। দূরবর্তী প্রদেশগুলোর কিছু মানুষ মদিনায় এসে অভিযোগ জানাতে শুরু করে। উসমান (রা.) তাঁদের কথা শুনতেন এবং সম্ভব হলে অভিযোগের সমাধান করতেন।

তবে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে আরও জটিল হয়ে ওঠে।

মিসর, কুফা ও বসরার কিছু অসন্তুষ্ট লোকের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। তারা নিজেদের অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করতে থাকে এবং একপর্যায়ে মদিনার দিকে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

এ সময় সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর অনেকেই উসমান (রা.)-কে পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক করেন। আলী ইবন আবি তালিব (রা.)-ও তাঁর সঙ্গে কথা বলেন এবং মানুষের অভিযোগ শোনার পরামর্শ দেন।

উসমান (রা.) জনগণের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং তাঁদের অভিযোগের কিছু বিষয়ে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু সমস্যা কেবল প্রশাসনিক অভিযোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না। কিছু লোক উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে আরও কঠোর অবস্থান গ্রহণ করতে শুরু করল।

এদিকে মদিনায় আসা বিদ্রোহীদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করা হয়। এক পর্যায়ে তারা ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্তও নেয়। কিন্তু পথিমধ্যে একটি চিঠিকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি আবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সেই চিঠিতে মিসর থেকে আগত বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ রয়েছে বলে তারা দাবি করে।

তারা সন্দেহ করতে থাকে, চিঠিটি উসমান (রা.)-এর পক্ষ থেকেই পাঠানো হয়েছে।

তখন তারা আবার মদিনায় ফিরে আসে এবং উসমান (রা.)-এর বাড়ি ঘেরাও করে।

উসমান (রা.) দৃঢ়ভাবে বলেন, তিনি এমন কোনো চিঠি লেখেননি এবং তাঁর অনুমতি ছাড়া এমন নির্দেশ দেওয়ার বিষয়েও তিনি অবগত নন। কিন্তু বিদ্রোহীরা তাঁর কথা গ্রহণ করেনি।

এভাবেই উসমান (রা.)-এর খিলাফতের শেষ পর্যায়ে মদিনার পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সাহাবায়ে কিরাম (রা.) তখন উসমান (রা.)-এর বাড়ি রক্ষা করার চেষ্টা করেন। আলী (রা.), হাসান (রা.), হুসাইন (রা.), আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা.)সহ বহু সাহাবির সন্তান ও অন্যান্য মুসলিম তাঁর বাড়ির চারপাশে অবস্থান নেন।

কিন্তু উসমান (রা.) মুসলিমদের মধ্যে রক্তপাত চাননি। তিনি তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিরোধের অনুমতি দেননি এবং তাঁর বাড়ি রক্ষায় যারা অস্ত্র ধরতে চেয়েছিল, তাদেরও সংযত থাকতে বলেন।

কারণ তিনি মনে করতেন, তাঁর জীবন রক্ষার জন্য যদি মদিনায় ব্যাপক রক্তপাত ঘটে, তাহলে মুসলিম উম্মাহর ক্ষতি আরও বড় হবে।

এদিকে অবরোধ ক্রমে কঠিন হয়ে ওঠে। উসমান (রা.)-এর বাড়িতে পানি ও খাদ্য পৌঁছানোও কঠিন হয়ে পড়ে।

এই সংকটের মধ্যেও তিনি নিজের জন্য প্রতিশোধের পথ বেছে নিলেন না। তিনি সাহাবিদের বারবার বললেন, তাঁর কারণে যেন কোনো মুসলিমের রক্ত ঝরে না যায়।

এ সময় উসমান (রা.)-এর জীবনের সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি আবার প্রকাশ পায়—ফিতনা এড়ানো এবং মুসলিমদের রক্তের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা।

কিন্তু পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল, যার পরিণতি আর সহজে ঠেকানো সম্ভব হচ্ছিল না।

মদিনায় উসমান (রা.)-এর বাড়ির অবরোধ ক্রমেই দীর্ঘ হতে থাকে। একদিকে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) তাঁকে রক্ষা করতে প্রস্তুত, অন্যদিকে বিদ্রোহীরা খলিফার পদত্যাগের দাবি জানাতে থাকে।

আর এই অবরোধের মধ্যেই মুসলিম উম্মাহ এমন এক ভয়াবহ ঘটনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, যার অভিঘাত শুধু উসমান (রা.)-এর জীবনে নয়—পরবর্তী সমগ্র ইসলামী ইতিহাসে গভীরভাবে পড়বে।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:

উসমান (রা.)-এর অবরোধ ও শাহাদাত — মদিনায় দীর্ঘ অবরোধ, সাহাবায়ে কিরামের প্রতিরোধের চেষ্টা, উসমান (রা.)-এর রক্তপাত এড়ানোর সিদ্ধান্ত এবং তাঁর মর্মান্তিক শাহাদাত।

পর্ব

১৮

উসমান (রা.)-এর অবরোধ ও শাহাদাত

মদিনায় দীর্ঘ অবরোধ, সাহাবায়ে কিরামের প্রতিরোধের চেষ্টা এবং এক মহান খলিফার মর্মান্তিক বিদায়

উসমান ইবন আফফান (রা.)-এর বাড়ি যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন মদিনার পরিস্থিতি ক্রমেই ভয়াবহ হয়ে উঠতে থাকে। খলিফার বাড়ির বাইরে বিদ্রোহীরা অবস্থান নেয় এবং ভেতরে উসমান (রা.) তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে অবরুদ্ধ হয়ে থাকেন।

সাহাবায়ে কিরামের অনেকেই উসমান (রা.)-কে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। আলী ইবন আবি তালিব (রা.) তাঁর দুই পুত্র হাসান ও হুসাইন (রা.)-কে উসমান (রা.)-এর বাড়ির দরজায় পাহারায় পাঠান। আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা.)সহ আরও কয়েকজন সাহাবির সন্তানও তাঁকে রক্ষার জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

কিন্তু উসমান (রা.) শুরু থেকেই মুসলিমদের মধ্যে যুদ্ধ ও রক্তপাত চাননি। তিনি তাঁর বাড়ি রক্ষাকারীদের অস্ত্র ব্যবহার না করার নির্দেশ দেন।

তাঁর কাছে নিজের জীবন রক্ষা করার চেয়েও মদিনায় মুসলিমদের পারস্পরিক সংঘর্ষ এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

অবরোধ দীর্ঘ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উসমান (রা.) ও তাঁর পরিবারের জন্য খাদ্য ও পানির সংকট দেখা দেয়। এ অবস্থায় আলী (রা.) তাঁর কাছে খাবার ও পানি পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। কিছু সাহাবিও তাঁকে সাহায্য করার চেষ্টা করেন।

উসমান (রা.) তখনও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দেননি।

তিনি জানতেন, তাঁর বাড়ির ভেতরে সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু হলে মদিনার রাস্তায় মুসলিমদের রক্ত ঝরবে। আর তিনি এমন একটি সংঘর্ষের কারণ হতে চাননি, যার পরিণতি আরও ভয়াবহ হতে পারে।

অবরোধের দিনগুলোতে তিনি কুরআন তিলাওয়াত ও ইবাদতে অধিক মনোযোগী হয়ে পড়েন।

এক রাতে তিনি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-কে দেখতে পান। তাঁর সঙ্গে আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.)-ও ছিলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তাঁরা অপেক্ষা করছেন। উসমান (রা.) এ স্বপ্নের পর বুঝতে পারেন, তাঁর জীবনের শেষ সময় অত্যন্ত নিকটে। (মুসনাদ আহমাদ; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ)

পরদিনও তিনি অবরোধের মধ্যেই রোজা রাখেন।

এদিকে বিদ্রোহীদের সংখ্যা ও চাপ বাড়তে থাকে। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) বারবার তাঁকে রক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু উসমান (রা.) তাঁদের অনুমতি দিলেন না।

তিনি মুসলিমদের মধ্যে রক্তপাতের মাধ্যমে নিজের জীবন রক্ষা করতে রাজি ছিলেন না।

অবশেষে ৩৫ হিজরির জিলহজ মাসে বিদ্রোহীরা তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করে।

সেদিন উসমান (রা.) কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন।

তিনি তখন বৃদ্ধ—প্রায় ৮২ বছর বয়সী। দীর্ঘ খিলাফত ও বিপুল দায়িত্ব পালনের পর জীবনের শেষ মুহূর্তেও তাঁর সামনে ছিল আল্লাহর কিতাব।

বিদ্রোহীরা তাঁকে হত্যা করে।

তাঁর রক্ত কুরআনের সেই মুসহাফের ওপর পড়ে, যা তিনি মুসলিম উম্মাহর ঐক্য রক্ষার জন্য প্রস্তুত ও প্রচার করেছিলেন—এমন বর্ণনা ইতিহাসের কিছু গ্রন্থে এসেছে। তবে এ দৃশ্যের বিস্তারিত বিবরণগুলোর সনদ একরকম শক্তিশালী নয়; তাই নিশ্চিত ঘটনা হিসেবে অতিরিক্ত বিবরণ দেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত।

উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের সংবাদ মদিনায় ছড়িয়ে পড়লে গভীর শোক নেমে আসে।

একজন খলিফা, একজন সাহাবি এবং রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর দুই কন্যার স্বামী—উসমান (রা.) এভাবেই মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের এক অশান্ত সময়ে শাহাদাতবরণ করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। একবার তিনি উহুদ পাহাড়ে আবু বকর (রা.), উমর (রা.) ও উসমান (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন পাহাড় কেঁপে উঠলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন,

> اثْبُتْ أُحُدُ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ
>
> অর্থ
>
> “হে উহুদ! স্থির হও। তোমার ওপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক এবং দুজন শহীদ রয়েছেন।”
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৬৭৫

এ হাদিসে উমর (রা.) ও উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের সুসংবাদ রয়েছে।

উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের মাধ্যমে খুলাফায়ে রাশেদীনের ইতিহাস এক অত্যন্ত কঠিন পর্যায়ে প্রবেশ করে। তাঁর মৃত্যুর পর মুসলিম উম্মাহর সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়—এখন কে নেতৃত্ব দেবেন?

মদিনার পরিস্থিতি তখন অত্যন্ত অস্থির। একদিকে খলিফার শাহাদাত, অন্যদিকে বিদ্রোহীদের উপস্থিতি এবং বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক উত্তেজনা—সব মিলিয়ে মুসলিম সমাজ গভীর সংকটে পড়ে।

এই সংকটময় মুহূর্তে সাহাবায়ে কিরামের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় আলী ইবন আবি তালিব (রা.)-এর দিকে।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
আলী (রা.)-এর খিলাফতের সূচনা — উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর সংকটময় পরিস্থিতিতে নেতৃত্ব গ্রহণ, বাইআত এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কঠিন দায়িত্ব।

চতুর্থ খলিফা

আলী ইবন আবি তালিব (রা.)

সংকট, জামাল ও সিফফিন, খাওয়ারিজ ও শাহাদাত

পর্ব ১৯ – ২৩

পর্ব

১৯

আলী (রা.)-এর খিলাফতের সূচনা

উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর সংকটময় পরিস্থিতিতে নেতৃত্ব গ্রহণ, বাইআত এবং ন্যায়বিচারের কঠিন দায়িত্ব

উসমান ইবন আফফান (রা.)-এর শাহাদাতের পর মদিনার পরিস্থিতি অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়ে। মুসলিম উম্মাহ এমন এক সংকটের মুখোমুখি হয়, যার কোনো সহজ সমাধান ছিল না।

উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীরা মদিনায় অবস্থান করছিল এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা বিদ্রোহীদের প্রভাব তখনও শেষ হয়নি। একই সময়ে মুসলিমদের মধ্যে নেতৃত্বের প্রশ্ন সামনে আসে। এমন পরিস্থিতিতে সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর একটি বড় অংশ আলী ইবন আবি তালিব (রা.)-এর দিকে ফিরে তাকান।

আলী (রা.) প্রথমে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন, মুসলিমরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে এমন একজনকে নির্বাচন করুক, যিনি এই কঠিন পরিস্থিতিতে উম্মাহকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবেন।

কিন্তু মদিনার পরিস্থিতি দ্রুত আরও সংকটপূর্ণ হয়ে উঠছিল। মুসলিমদের মধ্যে নেতৃত্বের শূন্যতা দীর্ঘায়িত হলে বিশৃঙ্খলা আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল।

তখন মুহাজির ও আনসারদের অনেক সাহাবি আলী (রা.)-এর কাছে এসে তাঁকে খলিফা হওয়ার অনুরোধ করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি মুসলিমদের স্বার্থে এই কঠিন দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হন।

আলী (রা.)-এর হাতে মদিনার মুসলিমরা বাইআত করেন এবং তিনি ৩৫ হিজরিতে ইসলামী রাষ্ট্রের চতুর্থ খলিফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

তাঁর খিলাফতের শুরুটাই ছিল অত্যন্ত কঠিন। উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডের বিচার কীভাবে হবে —এ প্রশ্নটি তখন মুসলিম সমাজের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ও নৈতিক সংকটে পরিণত হয়েছিল।

উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীরা তখনও সংগঠিত অবস্থায় ছিল। তাদের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা বিদ্রোহী ও বিশৃঙ্খলাকারী লোকজন ছিল। আলী (রা.)-এর হাতে তখন এমন কোনো সুসংগঠিত বাহিনী ছিল না, যার মাধ্যমে তিনি অবিলম্বে প্রত্যেক হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করে বিচার করতে পারতেন।

তাই তিনি প্রথমে রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং প্রশাসনকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার দিকে মনোযোগ দেন। তাঁর দৃষ্টিতে একটি স্থিতিশীল রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা না করে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু উসমান (রা.)-এর হত্যার বিচার দাবি করে মুসলিম সমাজের বিভিন্ন অংশে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়।

এ সময় আলী (রা.)-এর সামনে দুটি বড় দায়িত্ব এসে দাঁড়ায়—একদিকে উসমান (রা.)-এর হত্যার বিচার নিশ্চিত করা, অন্যদিকে মুসলিম উম্মাহকে গৃহযুদ্ধ থেকে রক্ষা করা।

এই সময় আলী (রা.)-এর ন্যায়পরায়ণতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রকাশ পায়। তিনি আত্মীয়তা, গোত্র বা রাজনৈতিক চাপের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চাননি। তাঁর কাছে শাসকের দায়িত্ব ছিল আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা।

আলী (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর চাচাতো ভাই ও জামাতা। তিনি অল্প বয়সেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর ঘনিষ্ঠ সাহাবিদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর জ্ঞান, সাহস, তাকওয়া ও বিচারবুদ্ধির জন্য তিনি সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন,

أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ

অর্থ

“তুমি আমার অংশ এবং আমি তোমার অংশ।”

— সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ২৬৯৯

আলী (রা.)-এর খিলাফতের সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পরিবর্তনও ঘটে। তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী মদিনা থেকে কুফায় স্থানান্তর করেন। এর পেছনে রাজনৈতিক ও সামরিক বাস্তবতা কাজ করেছিল। ইরাক তখন তাঁর শক্তির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এবং শামের

সঙ্গে সংঘাতের পরিস্থিতিতে কুফা থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা করা তাঁর কাছে অধিক উপযোগী মনে হয়।

কিন্তু রাজধানী পরিবর্তনের আগেই মুসলিম সমাজে রাজনৈতিক বিভাজন তীব্র হয়ে উঠেছিল।

একদিকে আলী (রা.)-এর নেতৃত্বে ইরাকের একটি বড় অংশ ছিল। অন্যদিকে শামের গভর্নর মুয়াবিয়া ইবন আবি সুফিয়ান (রা.) উসমান (রা.)-এর হত্যার বিচারকে অগ্রাধিকার দেওয়ার দাবি করছিলেন।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্টভাবে মনে রাখা জরুরি—এটি ছিল সাহাবায়ে কিরামের মধ্যকার একটি অত্যন্ত কঠিন ইজতিহাদি ও রাজনৈতিক সংকট। পরবর্তী ইতিহাসে এ ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র করে নানা অতিরঞ্জিত ও পক্ষপাতদুষ্ট বর্ণনা ছড়িয়ে পড়েছে। তাই সাহাবায়ে কিরাম (রা.) সম্পর্কে কথা বলার সময় নির্ভরযোগ্য বর্ণনা ও তাঁদের মর্যাদা—উভয়ই বিবেচনায় রাখা জরুরি।

আলী (রা.)-এর খিলাফতের শুরুতেই এ বিরোধ সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতি দ্রুত এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যেখানে দুই পক্ষের মধ্যে সামরিক সংঘর্ষের আশঙ্কা তৈরি হয়।

এভাবেই উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর শুরু হওয়া রাজনৈতিক সংকট আলী (রা.)-এর খিলাফতের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষায় রূপ নিতে থাকে।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে এবার এমন এক অধ্যায় শুরু হতে যাচ্ছে, যেখানে একই কিবলার অনুসারী, একই কুরআনের অনুসারী এবং রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর সাহাবিদের একটি অংশ পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে যাবে।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:

জামাল যুদ্ধ — উসমান (রা.)-এর হত্যার বিচার নিয়ে মতভেদ, আয়িশা (রা.), তালহা (রা.) ও যুবাইর (রা.)-এর অবস্থান, আলী (রা.)-এর সঙ্গে সমঝোতার প্রচেষ্টা এবং বসরার মর্মান্তিক সংঘর্ষ।

পর্ব

২০

জামাল যুদ্ধ

উসমান (রা.)-এর হত্যার বিচার, আয়িশা (রা.), তালহা (রা.) ও যুবাইর (রা.)-এর অবস্থান এবং বসরার মর্মান্তিক সংঘর্ষ

উসমান ইবন আফফান (রা.)-এর শাহাদাতের পর আলী ইবন আবি তালিব (রা.) খলিফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর খিলাফতের শুরুতেই মুসলিম উম্মাহ গভীর রাজনৈতিক সংকটে পড়ে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল—উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের কীভাবে এবং কখন বিচারের আওতায় আনা হবে?

আলী (রা.) নিজেও উসমান (রা.)-এর হত্যাকে সমর্থন করেননি। বরং তিনি হত্যাকারীদের শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে নীতিগতভাবে একমত ছিলেন। কিন্তু তখন মদিনা ও ইরাকে বিদ্রোহীদের একটি শক্তিশালী দল সক্রিয় ছিল এবং তাদের মধ্যে কারা সরাসরি হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল, তা নির্ধারণ ও গ্রেপ্তার করা সহজ ছিল না।

এদিকে উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা.), তালহা ইবন উবাইদুল্লাহ (রা.) এবং যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.)-সহ কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবি মনে করতেন, উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

তাঁরা প্রতিশোধের জন্য নয়, বরং উসমান (রা.)-এর হত্যার বিচার এবং মুসলিম সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে বসরার দিকে অগ্রসর হন।

এখানে তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি বিষয় পরিষ্কার রাখা জরুরি—তাঁরা আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে খিলাফত দখল করতে বের হয়েছিলেন—এমন সরল ব্যাখ্যা নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক চিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাঁদের মূল দাবির কেন্দ্রবিন্দু ছিল উসমান (রা.)-এর হত্যার বিচার।

অন্যদিকে আলী (রা.)-ও পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করতে চেয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন, মুসলিমদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে ক্ষতি হবে অপরিমেয়।

আলী (রা.) তাঁর বাহিনী নিয়ে ইরাকের দিকে অগ্রসর হন। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের লোকজন বসরার কাছে একত্রিত হয়।

এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়।

আলী (রা.) এবং আয়িশা (রা.)-এর পক্ষের নেতৃস্থানীয় সাহাবিদের মধ্যে কথাবার্তা হয়। তালহা (রা.) ও যুবাইর (রা.)-এর সঙ্গেও আলোচনা হয়। পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছিল, মুসলিমদের মধ্যে বড় ধরনের সংঘর্ষ এড়িয়ে একটি সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব হবে।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনায় এসেছে, আলোচনা ও সমঝোতার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু রাতের অন্ধকারে এমন কিছু ঘটনা ঘটে, যার ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্দেহ ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

এখানে ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—এই রাতের ঘটনাগুলোর বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে ঐতিহাসিক সূত্রে মতভেদ রয়েছে। তাই নিশ্চিত প্রমাণ ছাড়া কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে এর জন্য দায়ী করা ঠিক নয়।

পরদিন পরিস্থিতি হঠাৎ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। প্রথমে ছোটখাটো সংঘর্ষ হলেও তা দ্রুত পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে পরিণত হয়।

এ যুদ্ধ ইতিহাসে জামাল যুদ্ধ বা উটের যুদ্ধ নামে পরিচিত হয়। এর নামের কারণ, যুদ্ধের সময় আয়িশা (রা.) একটি উটে আরোহণ করে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর চারপাশে সাহাবিরা তাঁকে রক্ষা করছিলেন।

আলী (রা.) যুদ্ধ বন্ধ করার চেষ্টা করেন এবং বিশেষভাবে আয়িশা (রা.)-এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু যুদ্ধ তীব্র হয়ে ওঠে।

তালহা (রা.) ও যুবাইর (রা.)—উভয়েই ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অত্যন্ত সম্মানিত সাহাবি এবং জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবির অন্তর্ভুক্ত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> “আবু বকর জান্নাতে, উমর জান্নাতে, উসমান জান্নাতে, আলী জান্নাতে, তালহা জান্নাতে, যুবাইর জান্নাতে...”
>
> — জামে আত-তিরমিযি, হাদিস: ৩৭৪৭; হাদিসটি সহিহ

এ কারণে তাঁদের নিয়ে আলোচনা করার সময় অত্যন্ত সতর্ক ও সম্মানজনক ভাষা ব্যবহার করা জরুরি।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে তালহা (রা.) আহত হন। কিছু সময় পর তিনি ইন্তিকাল করেন। যুবাইর (রা.) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে গিয়েছিলেন। পরে তিনি নিহত হন। তাঁর হত্যার সংবাদ আলী (রা.)-এর কাছে পৌঁছালে তিনি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন।

আলী (রা.)-এর বাহিনী শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে বিজয়ী হয়।

আয়িশা (রা.)-কে কোনো অপমান বা অসম্মান করা হয়নি। আলী (রা.) তাঁর মর্যাদা রক্ষা করেন এবং তাঁকে যথাযথ সম্মানের সঙ্গে মদিনায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

আয়িশা (রা.)-এর সঙ্গে আলী (রা.)-এর সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ ঘটনা বিশেষভাবে স্মরণীয়। যুদ্ধের পর আলী (রা.) তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং আয়িশা (রা.)-ও পরবর্তীকালে আলী (রা.)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেননি।

বরং এ ঘটনায় জড়িত সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর মূলনীতি হলো—তাঁদের সম্পর্কে উত্তম ধারণা রাখা, তাঁদের ইজতিহাদি অবস্থানকে সম্মান করা এবং তাঁদের পারস্পরিক বিরোধকে বিদ্বেষ ও গালাগালির বিষয় না বানানো।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

অর্থ

“আর যারা তাদের (মুহাজির ও আনসারদের) পরে এসেছে, তারা বলে, ‘হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং আমাদের সেই ঈমানদার ভাইদের ক্ষমা করুন, যারা ঈমানে আমাদের আগে অগ্রগামী হয়েছে। আর যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই আপনি পরম স্নেহশীল, পরম দয়ালু।’”

— সূরা আল-হাশর, ৫৯:১০

জামাল যুদ্ধ ছিল মুসলিম ইতিহাসের এক অত্যন্ত বেদনাদায়ক অধ্যায়। একই কিবলার অনুসারী, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর সাহাবি এবং ইসলামের প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের একটি অংশ এতে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পড়েন।

এ ঘটনা আমাদের শেখায়, রাজনৈতিক সংকট যখন গভীর হয়, তখন ভুল বোঝাবুঝি, গুজব, উত্তেজনা ও পারস্পরিক অবিশ্বাস কত দ্রুত একটি সমাজকে সংঘাতের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

তবে এই ঘটনাকে সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা অস্বীকার করার কারণ বানানোও সঠিক নয়। তাঁরা মানুষ ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ইজতিহাদি মতপার্থক্য হয়েছে; কিন্তু তাঁদের ঈমান, ত্যাগ ও রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর সাহচর্যের মর্যাদা মুসলিম ইতিহাসে অনন্য।

জামাল যুদ্ধের পরও উসমান (রা.)-এর হত্যার বিচার এবং ইসলামী রাষ্ট্রের ঐক্যের প্রশ্ন পুরোপুরি সমাধান হয়নি। বরং আরেকটি শক্তিশালী রাজনৈতিক পক্ষের সঙ্গে আলী (রা.)-এর সংঘাত সামনে এসে দাঁড়ায়।

শামের গভর্নর মুয়াবিয়া ইবন আবি সুফিয়ান (রা.) উসমান (রা.)-এর হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত আলী (রা.)-এর বাইআত গ্রহণ করেননি। দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনার চেষ্টা ব্যর্থ হলে পরিস্থিতি ক্রমে যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যায়।

এবার মুসলিম উম্মাহর সামনে অপেক্ষা করছিল আরও কঠিন এক পরীক্ষা—সিফফিনের যুদ্ধ।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
সিফফিনের যুদ্ধ — আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.)-এর মধ্যে সংঘাত, উসমান (রা.)-এর হত্যার বিচারকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সংকট, যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং সালিশের সূচনা।

পর্ব

২১

সিফফিনের যুদ্ধ

আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.)-এর সংঘাত, উসমান (রা.)-এর হত্যার বিচার এবং সালিশের সূচনা

জামাল যুদ্ধের পর আলী ইবন আবি তালিব (রা.)-এর খিলাফতের সামনে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক সংকট হিসেবে রয়ে গেল উসমান ইবন আফফান (রা.)-এর হত্যার বিচার।

উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর আলী (রা.) খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু শামের গভর্নর মুয়াবিয়া ইবন আবি সুফিয়ান (রা.) তখনও তাঁর হাতে বাইআত করেননি। তাঁর অবস্থানের মূল কারণ ছিল—উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে বিচারিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আলী (রা.)-এর অবস্থান ছিল, প্রথমে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা সুসংহত করতে হবে। এরপর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ তদন্ত ও বিচার করা সম্ভব হবে। কারণ তখনকার পরিস্থিতিতে হত্যাকারীরা বিচ্ছিন্ন কোনো ছোট দল ছিল না; বরং তারা শক্তিশালী ও সংগঠিত অবস্থায় ছিল।

এ কারণে আলী (রা.) মনে করতেন, তাৎক্ষণিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গেলে আরও বড় রক্তপাত ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে।

অন্যদিকে মুয়াবিয়া (রা.) মনে করতেন, উসমান (রা.)-এর হত্যার বিচার বিলম্বিত করা উচিত নয়।

দুই পক্ষের মধ্যে এ মতপার্থক্য ধীরে ধীরে তীব্র রাজনৈতিক সংকটে রূপ নেয়।

আলী (রা.) ইরাকের কুফাকে নিজের রাজনৈতিক ও সামরিক কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। অন্যদিকে মুয়াবিয়া (রা.) শাম অঞ্চলে শক্তিশালী প্রশাসনিক ও সামরিক অবস্থান ধরে রেখেছিলেন।

পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, উভয় পক্ষের বাহিনী সিরিয়ার সিফফিন নামক স্থানে মুখোমুখি অবস্থান নেয়। সিফফিন ছিল ফোরাত নদীর তীরবর্তী একটি স্থান।

৩৭ হিজরির মুহাররম মাসে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধের আগে আলোচনা ও সমঝোতার চেষ্টা হয়। কিন্তু স্থায়ী সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

এরপর যুদ্ধ শুরু হয়।

সিফফিনের সংঘর্ষ ছিল দীর্ঘ ও অত্যন্ত কঠিন। উভয় পক্ষেই বহু মুসলিম নিহত হন। এটি ছিল মুসলিম উম্মাহর জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক পরিস্থিতি—কারণ দুই পক্ষেই ছিলেন এমন মানুষ, যারা নিজেদেরকে ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলিম সমাজের স্বার্থ রক্ষার পক্ষ হিসেবে মনে করতেন।

আলী (রা.)-এর বাহিনীতে বহু বিশিষ্ট সাহাবি ও তাবেয়ি ছিলেন। মুয়াবিয়া (রা.)-এর পক্ষেও শামের বহু সাহাবি ও মুসলিম যোদ্ধা ছিলেন।

এই যুদ্ধের বিস্তারিত ঘটনাবলি নিয়ে পরবর্তী ইতিহাসগ্রন্থগুলোতে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলোর সবগুলো সমানভাবে নির্ভরযোগ্য নয়। তাই নিশ্চিত প্রমাণ ছাড়া নির্দিষ্ট বক্তব্য বা ঘটনা সাহাবায়ে কিরামের নামে আরোপ করা উচিত নয়।

যুদ্ধ ক্রমে তীব্র আকার ধারণ করে।

এক পর্যায়ে আলী (রা.)-এর বাহিনী সামরিকভাবে অগ্রসর হচ্ছিল বলে পরিস্থিতি তৈরি হয়। তখন যুদ্ধ বন্ধ করে কুরআনকে সালিশের ভিত্তি করার আহ্বান ওঠে।

মুয়াবিয়া (রা.)-এর পক্ষ থেকে কুরআনের মুসহাফ উঁচু করে সালিশের আহ্বান জানানো হয়—এমন বর্ণনা ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে এসেছে। এ সময় আলী (রা.)-এর বাহিনীর মধ্যেও যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ও সালিশ গ্রহণ করা নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়।

আলী (রা.) প্রথমে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন বলে ঐতিহাসিক বর্ণনায় এসেছে। কিন্তু তাঁর বাহিনীর একটি অংশ সালিশ গ্রহণের জন্য প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত তিনি সালিশে সম্মত হন।

এর ফলে দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সাময়িকভাবে থেমে যায়।

সালিশের জন্য উভয় পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নির্ধারণ করা হয়। আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে আবু মুসা আল-আশআরি (রা.) এবং মুয়াবিয়া (রা.)-এর পক্ষ থেকে আমর ইবনুল আস (রা.)-এর নাম উল্লেখ করা হয়।

তবে সালিশের প্রকৃত প্রক্রিয়া, সেখানে কী কী সিদ্ধান্ত হয়েছিল এবং পরবর্তী ঘটনাগুলোর বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে ঐতিহাসিক সূত্রে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। তাই জনপ্রিয় কাহিনিতে প্রচলিত সব বিবরণকে নিশ্চিত ইতিহাস হিসেবে গ্রহণ করা ঠিক নয়।

সিফফিনের যুদ্ধের পর মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক বিভাজন আরও গভীর হয়ে ওঠে।

সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো—আলী (রা.)-এর নিজের বাহিনীর একটি অংশ সালিশ গ্রহণের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে শুরু করে।

তারা বলতে থাকে,

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

অর্থাৎ, “বিধান দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর।”

তারা মনে করেছিল, মানুষের মাধ্যমে সালিশ গ্রহণ করা আল্লাহর বিধানের বিরোধী। এ কারণে তারা আলী (রা.)-এর সিদ্ধান্ত থেকে নিজেদের আলাদা করে নেয়।

এই দলটি ইতিহাসে খাওয়ারিজ নামে পরিচিত হয়।

আলী (রা.) তাঁদের সঙ্গে প্রথমে আলোচনা ও যুক্তির মাধ্যমে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেন। তিনি তাঁদের ভুল ধারণা সংশোধনের চেষ্টা করেন এবং অযথা রক্তপাত এড়াতে চান।

কিন্তু পরিস্থিতি ধীরে ধীরে আরও জটিল হয়ে ওঠে।

এভাবেই সিফফিনের যুদ্ধ শুধু আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.)-এর রাজনৈতিক বিরোধকেই গভীর করেনি; বরং মুসলিম সমাজের ভেতর থেকে একটি নতুন চরমপন্থী রাজনৈতিক-ধর্মীয়

গোষ্ঠীর উত্থানের পথও তৈরি করে।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم পূর্বেই খাওয়ারিজ সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। সহিহ হাদিসে তাঁদের সম্পর্কে এসেছে যে, তারা দ্বীনের ব্যাপারে এমন কঠোরতা অবলম্বন করবে যে, কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের অন্তরে গভীরভাবে প্রবেশ করবে না। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৬১১; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১০৬৬)

সিফফিনের পর মুসলিম উম্মাহর সামনে এখন তিনটি বড় প্রশ্ন দাঁড়িয়ে গেল—উসমান (রা.)-এর হত্যার বিচার কীভাবে হবে, আলী (রা.)-এর খিলাফতের ভবিষ্যৎ কী হবে এবং খাওয়ারিজের বিদ্রোহ কীভাবে মোকাবিলা করা হবে।

এই সংকটের পরবর্তী অধ্যায়ে মুসলিম ইতিহাস আরও কঠিন এক পর্যায়ে প্রবেশ করবে।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
সালিশের পরিণতি ও খাওয়ারিজের উত্থান — আলী (রা.)-এর বাহিনীতে বিভাজন,
নাহরাওয়ানের যুদ্ধ এবং খাওয়ারিজের বিরুদ্ধে আলী (রা.)-এর অবস্থান।

পর্ব

২২

খাওয়ারিজের উত্থান ও নাহরাওয়ানের যুদ্ধ

আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ভুল আকীদার বিস্তার এবং ফিতনা দমনের কঠিন অধ্যায়

সিফফিনের যুদ্ধের পর আলী ইবন আবি তালিব (রা.)-এর খিলাফত আরও কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে প্রবেশ করে।

যুদ্ধের সমাপ্তি এবং সালিশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত তাঁর নিজের বাহিনীর মধ্যেই নতুন মতবিরোধ সৃষ্টি করেছিল। যারা প্রথমে আলী (রা.)-এর সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন, তাদের একটি অংশ পরবর্তীতে তাঁর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে আলাদা হয়ে যায়।

তাদের মূল আপত্তি ছিল—আলী (রা.) কেন মানুষের মাধ্যমে সালিশ গ্রহণ করলেন ?

তারা স্লোগান দিতে থাকে,

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

অর্থ

“বিধান দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর।”

বাক্যটি নিজে সত্য। কিন্তু তারা এর ভুল ব্যাখ্যা করেছিল। আলী (রা.) তাদের এই বক্তব্যের জবাবে বলেছিলেন,

> “এটি সত্য কথা, কিন্তু এর দ্বারা বাতিল উদ্দেশ্য গ্রহণ করা হয়েছে।”
>
> — সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১০৬৬

তাদের একটি দল আলী (রা.)-এর বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে হারুরা নামক স্থানে অবস্থান নেয়। এজন্য প্রথমদিকে তাদের হারুরিয়্যাহ নামেও উল্লেখ করা হয়।

আলী (রা.) তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেননি। বরং তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করার চেষ্টা করেন।

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.)-কে তাঁদের সঙ্গে কথা বলার জন্য পাঠানো হয়। ইবন আব্বাস (রা.) তাঁদের বক্তব্য শুনে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাঁদের ভুল বোঝানোর চেষ্টা করেন।

পরবর্তীতে আলী (রা.) নিজেও তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তাঁদের একটি অংশ নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আলী (রা.)-এর সঙ্গে ফিরে আসে।

কিন্তু সবাই ফিরে আসেনি।

একটি অংশ আলী (রা.)-এর বিরোধিতা অব্যাহত রাখে। তারা শুধু রাজনৈতিক বিরোধিতায় সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং অন্য মুসলিমদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করতে শুরু করে।

তারা মনে করতে থাকে, যারা তাদের মতের সঙ্গে একমত নয়, তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে বা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ।

এটি ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক চিন্তা।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم খাওয়ারিজ সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন,

> “তারা মুসলিমদের হত্যা করবে এবং মুশরিকদের ছেড়ে দেবে।”
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩১৬৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১০৬৪

আরেক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم তাঁদের সম্পর্কে বলেছেন,

> “তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়।”

— সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৬১১; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১০৬৪

খাওয়ারিজের একটি অংশ পরবর্তীতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সহিংসতা শুরু করে।

তারা নিরপরাধ মুসলিমদের হত্যা করতে থাকে। এমনকি আলী (রা.)-এর অনুসারী এবং অন্যান্য মুসলিমদের বিরুদ্ধেও তারা আক্রমণ চালায়।

এ অবস্থায় আলী (রা.)-এর সামনে আরেকটি কঠিন সিদ্ধান্ত এসে দাঁড়ায়।

একদিকে মুয়াবিয়া (রা.)-এর সঙ্গে রাজনৈতিক সংঘাত তখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি। অন্যদিকে খাওয়ারিজের বিদ্রোহ মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য তাৎক্ষণিক হুমকি হয়ে উঠেছিল।

আলী (রা.) প্রথমে তাঁদের বোঝানোর এবং ফিরে আসার সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু যখন তারা হত্যাকাণ্ড ও সশস্ত্র বিদ্রোহে অগ্রসর হয়, তখন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

অবশেষে ৩৮ হিজরির দিকে নাহরাওয়ান অঞ্চলে আলী (রা.)-এর বাহিনী ও খাওয়ারিজের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।

আলী (রা.) তাঁদের শেষবারের মতো ফিরে আসার সুযোগ দেন। তাঁদের একটি বড় অংশ যুদ্ধের আগেই দল ছেড়ে চলে যায়।

যারা থেকে যায়, তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়।

এরপর নাহরাওয়ানে যুদ্ধ শুরু হয়।

খাওয়ারিজের বাহিনী সংখ্যায় আলী (রা.)-এর বাহিনীর তুলনায় অনেক ছোট ছিল। যুদ্ধ অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হয় এবং খাওয়ারিজের বড় অংশ নিহত হয়।

আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকেও কিছু মানুষ নিহত হন।

নাহরাওয়ানের যুদ্ধের পর খাওয়ারিজের সামরিক শক্তি বড় আঘাতের মুখে পড়ে। কিন্তু তাদের চিন্তাধারা সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে যায়নি। পরবর্তী সময়ে তারা আবারও বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ ও সহিংসতা সৃষ্টি করে।

এই ঘটনায় আলী (রা.)-এর নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। তিনি মতভেদ হলেই যুদ্ধ করতে চাননি। প্রথমে আলোচনা, যুক্তি ও সংশোধনের সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন একটি দল মুসলিমদের জীবন ও নিরাপত্তার ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চালায়, তখন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

এখানে সাহাবায়ে কিরামের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি আমাদের সামনে আসে—ভুল ধারণা সংশোধনের ক্ষেত্রে জ্ঞান ও সংলাপ, আর সশস্ত্র সহিংসতার ক্ষেত্রে ন্যায়সংগত রাষ্ট্রীয় প্রতিরোধ।

নাহরাওয়ানের যুদ্ধের পরও আলী (রা.)-এর খিলাফতের সংকট শেষ হয়নি।

মুয়াবিয়া (রা.)-এর সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক বিরোধ তখনও চলছিল। শাম ও মিসরের মতো গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে আলী (রা.)-এর কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়ছিল। অন্যদিকে খাওয়ারিজের অবশিষ্ট সদস্যরাও তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে।

এই অস্থিরতার মধ্যেই আলী (রা.)-এর জীবনের শেষ অধ্যায় ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর প্রিয় সাহাবি, ইসলামের প্রথম যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর এবং চতুর্থ খলিফা আলী (রা.) খুব শিগগিরই এমন এক হামলার শিকার হবেন, যা তাঁর জীবন এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ—উভয়ের ইতিহাসে এক গভীর পরিবর্তন নিয়ে আসবে।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
আলী (রা.)-এর শাহাদাত — ইবনু মুলজিমের হামলা, আলী (রা.)-এর শেষ মুহূর্ত, তাঁর ওসিয়ত এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সমাপ্তি।

পর্ব

২৩

আলী (রা.)-এর শাহাদাত

ইবনু মুলজিমের হামলা, শেষ মুহূর্ত, ওসিয়ত এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের এক অধ্যায়ের সমাপ্তি

নাহরাওয়ানের যুদ্ধের পর আলী ইবন আবি তালিব (রা.)-এর খিলাফতের সংকট পুরোপুরি শেষ হয়নি। খাওয়ারিজের একটি অংশ নাহরাওয়ানে পরাজিত হলেও তাদের চিন্তাধারা ও রাজনৈতিক বিরোধিতা অব্যাহত থাকে।

অন্যদিকে মুয়াবিয়া (রা.)-এর সঙ্গে আলী (রা.)-এর রাজনৈতিক বিরোধও চলছিল। ফলে আলী (রা.)-এর খিলাফতের শেষ সময়টি ছিল অত্যন্ত কঠিন ও অস্থির।

এই পরিস্থিতিতে খাওয়ারিজের কয়েকজন ব্যক্তি আলী (রা.), মুয়াবিয়া (রা.) এবং আমর ইবনুল আস (রা.)-কে হত্যার পরিকল্পনা করে—এমন বর্ণনা ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে এসেছে। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক সংকটের জন্য যাঁদের তারা দায়ী মনে করত, তাঁদের হত্যা করা।

আলী (রা.)-কে হত্যার দায়িত্ব নেয় আবদুর রহমান ইবনু মুলজিম।

৪০ হিজরির রমজান মাসে ইবনু মুলজিম কুফায় আলী (রা.)-এর ওপর হামলার সুযোগ খুঁজতে থাকে।

একদিন ভোরে আলী (রা.) মসজিদে ফজরের সালাতের জন্য যাচ্ছিলেন। তখন ইবনু মুলজিম তাঁর ওপর তরবারি দিয়ে আঘাত করে।

আঘাতটি ছিল অত্যন্ত গুরুতর।

আলী (রা.)-কে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আঘাতের কারণে তাঁর অবস্থা ক্রমে সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে।

এই সময়ও আলী (রা.) প্রতিশোধের নামে সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করেন।

ইবনু মুলজিমকে আটক করার পর আলী (রা.) নির্দেশ দেন, যদি তিনি এই আঘাতের কারণে মৃত্যুবরণ করেন, তবে হত্যাকারীর বিরুদ্ধে একটি আঘাতের বেশি আঘাত করা যাবে না। অর্থাৎ প্রতিশোধের ক্ষেত্রেও ন্যায় ও সীমারেখা অতিক্রম করা যাবে না।

এটি আলী (রা.)-এর ন্যায়বিচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾

অর্থ

“কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদের ন্যায়বিচার থেকে বিরত না রাখে। তোমরা ন্যায়বিচার করো; এটাই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।”

— সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৮

আলী (রা.) তাঁর সন্তানদেরও আল্লাহভীতি, সালাত, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা এবং দুর্বলদের প্রতি সদাচরণের ব্যাপারে উপদেশ দেন।

তিনি তাঁদের আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি অবিচল থাকতে বলেন এবং দুনিয়ার মোহ থেকে সতর্ক করেন।

তাঁর শেষ সময়ে তাঁর সবচেয়ে বড় চিন্তাগুলোর একটি ছিল মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যৎ।

আলী (রা.) ৪০ হিজরির রমজান মাসে কুফায় ইন্তিকাল করেন। তাঁর বয়স কত ছিল—এ বিষয়ে ঐতিহাসিক বর্ণনায় কিছু মতভেদ রয়েছে; অধিকাংশ বর্ণনায় প্রায় ৬৩ বছর বলা হয়।

এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচাতো ভাই ও জামাতা, ইসলামের প্রথম যুগের অন্যতম সাহসী যোদ্ধা এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের চতুর্থ খলিফা আলী (রা.) শাহাদাতবরণ করেন।

তাঁর শাহাদাত মুসলিম উম্মাহর জন্য ছিল এক গভীর শোকের ঘটনা।

আলী (রা.)-এর জীবনের দিকে তাকালে আমরা ইসলামের ইতিহাসের এক অসাধারণ অধ্যায় দেখতে পাই। তিনি ছিলেন এমন একজন সাহাবি, যিনি শৈশবেই ইসলাম গ্রহণ করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করেন, ইসলামের কঠিন সময়ে তাঁর পাশে থাকেন এবং পরবর্তীতে মুসলিম উম্মাহর চতুর্থ খলিফার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ

অর্থ

“তুমি আমার অংশ এবং আমি তোমার অংশ।”

— সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ২৬৯৯

আলী (রা.)-এর শাহাদাতের মাধ্যমে খুলাফায়ে রাশেদীনের ধারাবাহিক খিলাফতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শেষ হয়ে আসে।

তবে মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বের প্রশ্ন তখনও শেষ হয়নি।

আলী (রা.)-এর মৃত্যুর পর ইরাকের মুসলিমরা তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসান ইবন আলী (রা.)-এর হাতে বাইআত করেন।

হাসান (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয় নাতি এবং আলী (রা.) ও ফাতিমা (রা.)-এর সন্তান।

তাঁর সামনে তখন ছিল অত্যন্ত কঠিন একটি সিদ্ধান্ত—তিনি কি পিতার রাজনৈতিক অবস্থান ধরে রেখে মুয়াবিয়া (রা.)-এর সঙ্গে সংঘাত চালিয়ে যাবেন, নাকি মুসলিমদের রক্তপাত বন্ধ

করার জন্য সমঝোতার পথ বেছে নেবেন ?

এই সিদ্ধান্তই পরবর্তী ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তন করবে।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বহু বছর আগে হাসান (রা.) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন,

إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

অর্থ

“আমার এই সন্তান (নাতি) একজন নেতা। আশা করা যায়, আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে মুসলিমদের দুটি বৃহৎ দলের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন।”

— সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৬২৯

এই হাদিসের বাস্তবতা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মুসলিম ইতিহাসে প্রকাশ পাবে।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:

হাসান (রা.)-এর খিলাফত ও ঐতিহাসিক সন্ধি — আলী (রা.)-এর শাহাদাতের পর নেতৃত্ব গ্রহণ, মুয়াবিয়া (রা.)-এর সঙ্গে সংঘাতের সম্ভাবনা এবং মুসলিমদের রক্তপাত বন্ধে হাসান (রা.)-এর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত।



সমাপনী পর্যায়

হাসান (রা.) ও সামগ্রিক মূল্যায়ন

ঐক্যের সন্ধি, ইন্তিকাল এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের শিক্ষা

পর্ব ২৪ – ২৬

পর্ব

২৪

হাসান (রা.)-এর খিলাফত ও ঐতিহাসিক সন্ধি

আলী (রা.)-এর শাহাদাতের পর নেতৃত্ব, মুয়াবিয়া (রা.)-এর সঙ্গে সংঘাতের সম্ভাবনা এবং মুসলিমদের রক্তপাত বন্ধের মহান সিদ্ধান্ত

আলী ইবন আবি তালিব (রা.)-এর শাহাদাতের পর কুফার মুসলিমরা তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসান ইবন আলী (রা.)-এর হাতে বাইআত করেন। এ সময় ৪০ হিজরি।

হাসান (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর প্রিয় নাতি। তিনি ছিলেন আলী (রা.) ও ফাতিমা (রা.)-এর জ্যেষ্ঠ সন্তান এবং রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে বেড়ে ওঠা একজন সম্মানিত সাহাবি।

আলী (রা.)-এর শাহাদাতের পর মুসলিম উম্মাহ তখনও রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত। ইরাকের একটি বড় অংশ হাসান (রা.)-এর সঙ্গে ছিল। অন্যদিকে শাম অঞ্চলের মুসলিমরা মুয়াবিয়া ইবন আবি সুফিয়ান (রা.)-এর নেতৃত্বে ছিল।

ফলে হাসান (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তাঁর সামনে আবারও যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দেয়।

মুয়াবিয়া (রা.) তখন শামের শক্তিশালী প্রশাসক ছিলেন এবং তাঁর অধীনে একটি সুসংগঠিত বাহিনী ছিল। হাসান (রা.)-এর পক্ষেও ইরাকের একটি বাহিনী প্রস্তুত হয়।

দুই পক্ষের মধ্যে আবার যুদ্ধ শুরু হলে মুসলিমদের আরও ব্যাপক প্রাণহানি ঘটতে পারত।

এই পরিস্থিতিতে হাসান (রা.) বুঝতে পারলেন, মুসলিমদের মধ্যে ধারাবাহিক যুদ্ধ চলতে থাকলে ইসলামী রাষ্ট্রের শক্তি দুর্বল হবে এবং শত্রুরা এর সুযোগ নিতে পারে।

তাই তিনি যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তির পথ খুঁজতে শুরু করেন।

এখানেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবতা প্রকাশ পেতে শুরু করে, যা তিনি হাসান (রা.)-এর শৈশবেই করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

অর্থ

“আমার এই সন্তান একজন নেতা। আশা করা যায়, আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে মুসলিমদের দুটি বৃহৎ দলের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন।”

— সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৬২৯

হাসান (রা.)-এর সিদ্ধান্ত এই ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে মিলে যায়।

তিনি বুঝেছিলেন, খিলাফতের পদ ধরে রাখাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। মুসলিমদের রক্তপাত বন্ধ করা এবং উম্মাহর ঐক্য রক্ষা করাও একজন নেতার বড় দায়িত্ব।

অবশেষে হাসান (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.)-এর মধ্যে সমঝোতা হয়।

হাসান (রা.) খিলাফতের দাবি ছেড়ে দিয়ে মুয়াবিয়া (রা.)-এর হাতে নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

এ ঘটনা ৪১ হিজরিতে সংঘটিত হয়।

এই বছরটি ইসলামের ইতিহাসে ‘আমুল জামাআহ’ বা ঐক্যের বছর নামে পরিচিত।

কারণ এই সন্ধির মাধ্যমে মুসলিমদের দুই বৃহৎ রাজনৈতিক পক্ষের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের অবসান ঘটে এবং মুসলিম উম্মাহ আবার একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে একত্রিত হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণীও এভাবেই বাস্তব রূপ লাভ করে।

হাসান (রা.)-এর এই সিদ্ধান্তকে দুর্বলতা বা পরাজয় হিসেবে দেখা সঠিক নয়। বরং এটি ছিল মুসলিমদের রক্তপাত বন্ধ করার জন্য একজন নেতার অত্যন্ত কঠিন আত্মত্যাগ।

তিনি চাইলে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ধরে রেখে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি নিজের রাজনৈতিক অবস্থানের চেয়ে মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেন।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে "সাইয়্যিদ" বা নেতা হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন।

হাসান (রা.)-এর এই সিদ্ধান্ত আমাদের সামনে নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা তুলে ধরে—কখনো কখনো নিজের অধিকার ছেড়ে দেওয়াও বৃহত্তর কল্যাণের জন্য মহৎ সিদ্ধান্ত হতে পারে।

এই সন্ধির মাধ্যমে খুলাফায়ে রাশেদীনের ধারাবাহিকতার একটি বিশেষ সমাপ্তি ঘটে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ الْمُلْكُ بَعْدَ ذَلِكَ

অর্থ

"আমার উম্মতের মধ্যে খিলাফত ত্রিশ বছর থাকবে; এরপর রাজত্ব হবে।"

— সুনান আবি দাউদ, হাদিস: ৪৬৪৬; জামে আত-তিরমিযি, হাদিস: ২২২৬

আবু বকর (রা.)-এর খিলাফত, উমর (রা.)-এর খিলাফত, উসমান (রা.)-এর খিলাফত এবং আলী (রা.)-এর খিলাফতের পর হাসান (রা.)-এর এই স্বল্পকালীন নেতৃত্ব সেই ত্রিশ বছরের সময়কাল পূর্ণ করে।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—হাসান (রা.)-এর এই পদক্ষেপের মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যে রক্তপাত বন্ধ হয়েছিল। তাঁর নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পেয়েছিল যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে নয়, বরং যুদ্ধ বন্ধ করার মাধ্যমে।

তাঁর এই সিদ্ধান্তের পর মুয়াবিয়া (রা.) মুসলিম উম্মাহর একক রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

এভাবেই রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর ইন্তিকালের পর আবু বকর (রা.) থেকে শুরু হওয়া খুলাফায়ে রাশেদীনের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা হাসান (রা.)-এর মাধ্যমে একটি বিশেষ পর্যায়ে এসে শেষ হয়।

তবে এখানেই ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাস শেষ হয়নি। বরং মুসলিম বিশ্বের ইতিহাস নতুন এক যুগে প্রবেশ করে—যেখানে ইসলামী রাষ্ট্র আরও বিস্তৃত হবে, নতুন নতুন অঞ্চল বিজিত হবে এবং মুসলিম সভ্যতার রাজনৈতিক কাঠামো নতুন রূপ লাভ করবে।

কিন্তু তার আগে আমাদের ফিরে তাকাতে হবে খুলাফায়ে রাশেদীনের পুরো যুগের দিকে—আবু বকর (রা.) থেকে হাসান (রা.) পর্যন্ত এই মহান ব্যক্তিত্বদের নেতৃত্ব, ত্যাগ, ন্যায়বিচার, প্রশাসন, বিজয়, ফিতনা ও আত্মসংযম থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই ?

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের সমাপ্তি ও সামগ্রিক শিক্ষা — আবু বকর (রা.) থেকে হাসান (রা.) পর্যন্ত নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা, ন্যায়বিচার, শূরা, ত্যাগ, ফিতনা থেকে শিক্ষা এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য তাঁদের স্থায়ী উত্তরাধিকার।

পর্ব

২৫

হাসান (রা.)-এর পরবর্তী জীবন ও ইন্তিকাল

খিলাফত থেকে সরে দাঁড়ানোর পর তাঁর জীবন, মর্যাদা এবং মদিনায় প্রত্যাবর্তন

৪১ হিজরিতে হাসান ইবন আলী (রা.)-এর সঙ্গে মুয়াবিয়া (রা.)-এর সন্ধির মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর দীর্ঘ রাজনৈতিক সংঘাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের অবসান ঘটে।

হাসান (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে অর্পণ করার পর মদিনায় ফিরে আসেন এবং রাজনীতি ও রাষ্ট্রক্ষমতার পরিবর্তে ইবাদত, জ্ঞানচর্চা এবং ব্যক্তিগত জীবনের দিকে মনোনিবেশ করেন।

তাঁর এই সিদ্ধান্ত ছিল মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের জন্য একটি বড় আত্মত্যাগ।

তিনি নিজের রাজনৈতিক অধিকার ও ক্ষমতা ধরে রাখার পরিবর্তে মুসলিমদের রক্তপাত বন্ধ করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর জীবনের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত হয়ে আছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান (রা.) সম্পর্কে বলেছেন,

إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

অর্থ

“আমার এই সন্তান (নাতি) একজন নেতা। আশা করা যায়, আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে মুসলিমদের দুটি বৃহৎ দলের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন।”

— সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৬২৯

হাসান (রা.)-এর জীবনে এই ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবতা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয় নাতি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং তাঁর মর্যাদা প্রকাশ করেছেন।

একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান (রা.) ও হুসাইন (রা.) সম্পর্কে বলেছেন,

الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

অর্থ

“হাসান ও হুসাইন জান্নাতের যুবকদের নেতা।”

— জামে আত-তিরমিযি, হাদিস: ৩৭৬৮

আরেকবার রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم হাসান (রা.)-কে নিয়ে বলেছিলেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ

অর্থ

“হে আল্লাহ! আমি তাকে ভালোবাসি, অতএব আপনিও তাকে ভালোবাসুন।”

— সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৭৪৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৪২১

হাসান (রা.)-এর জীবন আমাদের সামনে নেতৃত্বের এমন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, যেখানে ক্ষমতা গ্রহণের চেয়ে প্রয়োজনে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়াকেও মহৎ কাজ হিসেবে দেখা যায়।

তাঁর সন্ধির ফলে মুসলিমদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী রক্তপাত বন্ধ হয় এবং মুসলিম উম্মাহ একটি কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনে একত্রিত হয়।

পরবর্তী বছরগুলোতে হাসান (রা.) মদিনায় অবস্থান করেন।

তাঁর ইন্তিকালের সঠিক বছর নিয়ে ঐতিহাসিক সূত্রে কিছু মতভেদ থাকলেও অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে তিনি ৪৯ বা ৫০ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বয়স ছিল আনুমানিক ৪৬–৪৭ বছর।

তাঁর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কেও বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনা রয়েছে। তাঁকে বিষপ্রয়োগ করা হয়েছিল —এমন বর্ণনা প্রসিদ্ধ হলেও কে বিষ দিয়েছিল এবং এর পেছনে কার ভূমিকা ছিল—এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্যভাবে প্রমাণিত কোনো তথ্য নেই। তাই এ বিষয়ে নিশ্চিত অভিযোগ করা সঠিক নয়।

হাসান (রা.)-এর ইন্তিকালের মাধ্যমে আহলে বাইতের একজন মহান ব্যক্তিত্বের দুনিয়াবি জীবন শেষ হয়।

তিনি ছিলেন আলী (রা.) ও ফাতিমা (রা.)-এর সন্তান, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর নাতি এবং মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী একজন সম্মানিত সাহাবি।

তাঁর জীবন আমাদের শেখায়—নেতৃত্ব মানে শুধু ক্ষমতা ধরে রাখা নয়; কখন কোথায় নিজের অবস্থান থেকে সরে দাঁড়ালে উম্মাহর কল্যাণ হবে, তা বুঝতে পারাও নেতৃত্বের অংশ।

আবু বকর (রা.) থেকে শুরু করে উমর (রা.), উসমান (রা.), আলী (রা.) এবং হাসান (রা.) —এই ধারাবাহিকতায় আমরা এমন এক যুগ দেখতে পাই, যেখানে ইসলামী রাষ্ট্র একদিকে বিস্তৃত হয়েছে, অন্যদিকে কঠিন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছে।

এই ইতিহাস শুধু বিজয় ও রাষ্ট্রবিস্তারের ইতিহাস নয়; এটি ঈমান, আমানতদারি, ন্যায়বিচার, শূরা, আত্মত্যাগ, ধৈর্য এবং ফিতনার সময়ে সঠিক অবস্থান গ্রহণের ইতিহাস।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের সামগ্রিক মূল্যায়ন — আবু বকর (রা.) থেকে হাসান (রা.) পর্যন্ত নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা, ন্যায়বিচার, শূরা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, দাওয়াত, বিজয়, ফিতনা থেকে শিক্ষা এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য তাঁদের স্থায়ী উত্তরাধিকার।

পর্ব

২৬

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের সামগ্রিক মূল্যায়ন

ন্যায়ভিত্তিক নেতৃত্ব, শূরা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, বিজয়, ফিতনা এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য স্থায়ী শিক্ষা

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর ইন্তিকালের পর মুসলিম উম্মাহ এক নতুন যুগে প্রবেশ করে। ওহির ধারা সমাপ্ত হয়েছে, কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব এসে পড়ে সাহাবায়ে কিরামের ওপর।

এই দায়িত্ব সর্বপ্রথম গ্রহণ করেন আবু বকর আস-সিদ্দীক (রা.)। তাঁর মাধ্যমে শুরু হয় ইসলামের ইতিহাসের সেই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়, যা খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ নামে পরিচিত।

আবু বকর (রা.), উমর (রা.), উসমান (রা.), আলী (রা.) এবং পরবর্তীতে হাসান (রা.)—এই ধারাবাহিক নেতৃত্ব মুসলিম উম্মাহর জন্য এমন এক আদর্শ স্থাপন করেছে, যা কেবল ইতিহাসের অংশ নয়; বরং আজও মুসলিম সমাজের জন্য দিকনির্দেশনা।

আবু বকর (রা.) ইসলামের মৌলিক ভিত্তিকে অটুট রাখেন। রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর ইন্তিকালের পর যখন কেউ কেউ যাকাত অস্বীকার করে এবং কেউ কেউ মিথ্যা নবুয়তের দাবি করে, তখন তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, দ্বীনের কোনো বিধান পরিবর্তন করা যাবে না। তাঁর দৃঢ় নেতৃত্বের কারণেই মুসলিম উম্মাহ বিভক্ত হয়ে পড়েনি এবং আরব উপদ্বীপে ইসলামের ভিত্তি পুনরায় সুদৃঢ় হয়।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) সেই ভিত্তির ওপর একটি সুবিশাল, সুসংগঠিত ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। তাঁর সময়ে শাম, ইরাক, পারস্য ও মিসরের বিশাল অঞ্চল ইসলামী রাষ্ট্রের

অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনি বায়তুল মাল, বিচারব্যবস্থা, শূরা, হিজরি সন, প্রশাসনিক বিভাগ এবং জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থাকে এমনভাবে সংগঠিত করেন, যা পরবর্তী বহু যুগের শাসকদের জন্য আদর্শ হয়ে থাকে।

উসমান ইবন আফফান (রা.)-এর যুগে ইসলামী রাষ্ট্র আরও বিস্তৃত হয়। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান ছিল কুরআনের কিরাআতের ভিন্নতার কারণে সম্ভাব্য বিভ্রান্তি দূর করতে উসমানী মুসহাফ প্রস্তুত ও বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো। তাঁর এই উদ্যোগের ফলে আল্লাহর কিতাব একই রূপে সংরক্ষিত থাকে এবং মুসলিম উম্মাহ কুরআনের পাঠে ঐক্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

আলী ইবন আবি তালিব (রা.)-এর যুগ ছিল ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষাগুলোর একটি। তাঁর শাসনামলে মুসলিম সমাজ অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট, গৃহযুদ্ধ এবং খাওয়ারিজের বিদ্রোহের মুখোমুখি হয়। তবুও তিনি ন্যায়বিচার, ধৈর্য এবং শরিয়তের নীতির বাইরে কোনো পথ গ্রহণ করেননি।

হাসান ইবন আলী (রা.) নিজের রাজনৈতিক অধিকার ত্যাগ করে মুসলিমদের রক্তপাত বন্ধ করেন এবং উম্মাহর ঐক্যকে অগ্রাধিকার দেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তব রূপ হয়ে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ আমাদের শেখায় যে, ইসলামে নেতৃত্ব কোনো সম্মান বা ক্ষমতার বিষয় নয়; এটি একটি আমানত এবং জবাবদিহির দায়িত্ব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

অর্থ

“তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।”

— সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৮৯৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৮২৯

এই যুগ আরও শিক্ষা দেয় যে, মুসলিমদের শক্তি কেবল সামরিক বিজয়ে নয়; বরং ঈমান, তাকওয়া, ন্যায়বিচার, আমানতদারিতা, শূরা এবং কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণের মধ্যেই নিহিত।

একই সঙ্গে এই যুগ আমাদের ফিতনার বাস্তবতাও স্মরণ করিয়ে দেয়। সাহাবায়ে কিরামের সময়েও কঠিন রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল। তাই পরবর্তী প্রজন্মের কর্তব্য হলো তাঁদের সম্পর্কে সম্মানজনক ভাষা ব্যবহার করা, নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের ওপর নির্ভর করা এবং তাঁদের পারস্পরিক ইজতিহাদি মতভেদকে বিদ্বেষের কারণ না বানানো।

আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কিরাম এবং তাঁদের অনুসারীদের সম্পর্কে বলেন,

﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٠٠﴾

অর্থ

“আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য।”

— সূরা আত-তাওবা, ৯:১০০

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের সবচেয়ে বড় উত্তরাধিকার হলো—কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা, আমানত রক্ষা করা, পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, মানুষের

অধিকার সংরক্ষণ করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সকল ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া।

এই মহান ব্যক্তিত্বদের জীবন শুধু পড়ার জন্য নয়; বরং ব্যক্তিজীবন, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র—প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করার জন্য।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সাহাবায়ে কিরামের প্রতি ভালোবাসা, তাঁদের আদর্শ থেকে শিক্ষা গ্রহণ এবং কুরআন ও সহিহ সুন্নাহর ওপর অবিচল থাকার তাওফিক দান করুন। আমীন।

এভাবেই খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবন ধারাবাহিকের সমাপ্তি হলো। আল্লাহ তাআলার অশেষ অনুগ্রহে আমরা আবু বকর (রা.) থেকে হাসান (রা.) পর্যন্ত ইসলামের এই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা করেছি।

উদ্ধৃত সূত্রসমূহ

প্রতিটি পর্বে যে সূত্রগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, পর্ব অনুযায়ী সেগুলোর তালিকা।

পর্ব ১ · আবু বকর আস-সিদ্দীক (রা.)

- মুসতাদরাক আল-হাকিম, হাদিস: ৪৪০৭; সনদ হাসান বলে বহু আলিম উল্লেখ করেছেন
- সূরা আত-তাওবা, ৯:৪০
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৬৮৩; ৭২১৯
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৭২১৮–৭২১৯
- আত-তারীখ, আত-তাবারি; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ

পর্ব ২ · রিদ্দার যুদ্ধ

- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৬২১; তারীখ আত-তাবারি; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ১৪০০; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২০
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ১৪০০
- সহিহ আল–বুখারি, হাদিস: ৪০৭২

পর্ব ৩ · কুরআন সংকলনের সূচনা

- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪৯৮৬
- সূরা আল-হিজর, ১৫:৯

পর্ব ৪ · উসামাহ ইবন যায়েদ (রা.)-এর বাহিনী প্রেরণ

- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৭৩৫; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৪২২
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪৪৬৯; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৪২৬
- আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ; তারীখ আত-তাবারি — অর্থগত বর্ণনা
- আল-মুওয়াত্তা, ইমাম মালিক; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ — অর্থগতভাবে বর্ণিত
- আল-মুওয়াত্তা; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ
- সূরা আন-নিসা, ৪:৫৯

পর্ব ৫ · ইরাক ও শাম বিজয়ের সূচনা

- আত-তাবারি; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ

- আল-মুওয়াত্তা, ইমাম মালিক; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ
- আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ
- সূরা আলে ইমরান, ৩:২০০

পর্ব ৬ · আবু বকর (রা.)-এর শেষ দিনগুলো, উমর (রা.)-কে উত্তরসূরি মনোনয়ন এবং একজন মহান খলিফার ইন্তিকাল

- তারীখ আত-তাবারি; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ
- আত-তাবারি; ইবন কাসির
- মুসান্নাফ ইবন আবি শাইবাহ; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ১৩৯২; ঐতিহাসিক সূত্র
- সুনান আত-তিরমিযি, হাদিস: ৩৭৯০; সহিহ
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৬৫৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৩৮২

পর্ব ৭ · উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)

- সুনান আত-তিরমিযি, হাদিস: ৩৬৮১; হাসান
- তারীখ আত-তাবারি; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ
- আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ; সিফাতুস সাফওয়াহ
- সূরা আন-নাহল, ১৬:৯০
- সুনান আত-তিরমিযি, হাদিস: ৩৬৮৬; হাসান
- সুনান আত-তিরমিযি, হাদিস: ৩৬৮২; সহিহ

পর্ব ৮ · ইয়ারমুকের বিজয়

- সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭:৭
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৭১; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১০৩৭

পর্ব ৯ · কাদিসিয়ার যুদ্ধ ও পারস্য বিজয়ের সূচনা

- তারীখ আত-তাবারি; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ
- আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ
- আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ; আত-তাবারি
- অর্থগতভাবে; ঐতিহাসিক বর্ণনা
- সূরা আলে ইমরান, ৩:১২৬

পর্ব ১০ · বায়তুল মুকাদ্দাস (জেরুজালেম) বিজয়

- সূরা আল-মুনাফিকুন, ৬৩:৮

- তারীখ আত-তাবারি; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ১১৮৯; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৩৯৭

পর্ব ১১ · উমর (রা.)-এর রাষ্ট্রব্যবস্থা ও প্রশাসনিক সংস্কার

- আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ

পর্ব ১২ · আমওয়াসের মহামারি ও উমর (রা.)-এর নেতৃত্ব

- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৫৭২৯; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২২১৯
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৫৭২৯
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৫৭২৮; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২২১৯
- আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ; তারীখ আত-তাবারি

পর্ব ১৩ · উমর (রা.)-এর শাহাদাত

- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ১৮৯০
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৭০০
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৭২১৮
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৭২০৭–৭২১০
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ১৩৯২

পর্ব ১৪ · উসমান ইবন আফফান (রা.)-এর খিলাফতের সূচনা

- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৭২০৭–৭২১০
- সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৪০১
- জামে আত-তিরমিযি, হাদিস: ৩৭০১; হাদিসটি হাসান বলে বহু মুহাদ্দিস গ্রহণ করেছেন।

পর্ব ১৫ · উসমান (রা.)-এর শাসনামলে ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তার

- তারীখ আত-তাবারি; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ

পর্ব ১৮ · উসমান (রা.)-এর অবরোধ ও শাহাদাত

- মুসনাদ আহমাদ; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৬৭৫

পর্ব ১৯ · আলী (রা.)-এর খিলাফতের সূচনা

- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ২৬৯৯

পর্ব ২০ · জামাল যুদ্ধ

- জামে আত-তিরমিযি, হাদিস: ৩৭৪৭; হাদিসটি সহিহ
- সূরা আল-হাশর, ৫৯:১০

পর্ব ২১ · সিফফিনের যুদ্ধ

- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৬১১; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১০৬৬

পর্ব ২২ · খাওয়ারিজের উত্থান ও নাহরাওয়ানের যুদ্ধ

- সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১০৬৬
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩১৬৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১০৬৪
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৬১১; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১০৬৪

পর্ব ২৩ · আলী (রা.)-এর শাহাদাত

- সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৮
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ২৬৯৯
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৬২৯

পর্ব ২৪ · হাসান (রা.)-এর খিলাফত ও ঐতিহাসিক সন্ধি

- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৬২৯
- সুনান আবি দাউদ, হাদিস: ৪৬৪৬; জামে আত-তিরমিযি, হাদিস: ২২২৬

পর্ব ২৫ · হাসান (রা.)-এর পরবর্তী জীবন ও ইন্তিকাল

- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৬২৯
- জামে আত-তিরমিযি, হাদিস: ৩৭৬৮
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৭৪৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৪২১

পর্ব ২৬ · খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের সামগ্রিক মূল্যায়ন

- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৮৯৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৮২৯
- সূরা আত-তাওবা, ৯:১০০

খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবন

কুরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে

সংকলন ও সম্পাদনা: ইহছানুল হক ছাজিদ